ইভান তুর্গেনেভ
মুমু

ইভান তুর্গেনেভ
মুমু

অনুবাদ: **রাধামোহন ভট্টাচার্য্য**

সম্পাদনা: **ননী ভৌমিক**

অঙ্গসজ্জা: **ইউ. বেরকোভস্কি**

প্রগতি প্রকাশন

১৯৭৩

প্রকাশকের নিবেদন

আদরের কিশোর বন্ধুরা!

রুশ চিরায়ত সাহিত্যিক ইভান সের্গেয়েভিচ তুর্গেনেভের (১৮১৮—১৮৮৩) একটি কাহিনী দিচ্ছি তোমাদের হাতে — 'মুমু'।

কুকুর 'মুমু'র জন্যে পরাধীন ভূমিদাস চাষী, মূক-বধির গেরাসিমের অসীম দরদ ও মর্মস্পর্শী ভালোবাসা, সাধারণ লোকের প্রতি তার অনাবিল সহৃদয়তা, সেই দূর অতীতের চাষীদের শোকাবহ দূরবস্থার কাহিনী এটি।

'প্রগতি প্রকাশন' থেকে বাঙলা ভাষায় ছোটোদের জন্যে প্রকাশিত 'রামধনু' সিরিজের আরেকটি বই এতে বাড়ল।

এ সিরিজের বই তোমরা আগেই পড়েছ বোধহয়:

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের কথা — 'স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা';

সোভিয়েত লেখকদের গল্প-সঙ্কলন — 'বৃষ্টি আর নক্ষত্র';

আ. আলেক্সিনের মজার উপন্যাস — 'ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক ঘটনা';

ল. ভরোঙকভার দুটি বড়ো গল্প একত্রে — 'যাদু তীর', 'শহরের মেয়ে';

প্রথম ব্যোমনাবিক, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ইউরি গাগারিন লিখিত ও বহু ফোটোগ্রাফে সচিত্র — 'পৃথিবী দেখছি';

আ. বেলায়েভের বৈজ্ঞানিক কল্পোপন্যাস — 'উভচর মানুষ'।

বইগুলি তোমাদের কেমন লাগল, আরো কী তোমরা চাও, জানতে পেলে খুশী হব।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

১

মস্কোর উপকণ্ঠে এক রাস্তায়, সাদা সাদা থাম, চিলে কোঠা আর হেলে পড়া এক ঝুল বারান্দাওয়ালা একটি ধূসর বাড়িতে একগাদা ঝি-চাকর পরিবৃত হয়ে বাস করতেন এক বিধবা জমিদারণী। তাঁর ছেলেরা থাকত পিটার্সবুর্গে, সরকারী চাকরী উপলক্ষে, মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল; নিজে তিনি বড় একটা কোথাও যেতেন না, কৃপণতা আর একঘেয়েমি ভরা বার্ধক্যের জীবন নির্জনেই কাটাতেন। তাঁর জীবনের ম্যাড়মেড়ে নিরানন্দ দিন বহুকাল ফুরিয়েছিল, আর সন্ধ্যাকাল ছিল রাত্রির চেয়েও অন্ধকার।

তাঁর সমস্ত ঝি-চাকরদের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল গেরাসিম জমাদার, চার হাত লম্বা মরদ, দৈত্যের মতন চেহারা, কিন্তু জন্ম থেকে বোবাকালা। তার কর্ত্রী তাকে এনেছিলেন গাঁ থেকে। সেখানে সে থাকত একলা, তার ভাইদের থেকে আলাদা একটি ছোট কুঁড়েঘরে। সবাই মনে করত গাঁয়ের চাষীদের মধ্যে সেই বোধহয় সবচেয়ে বাধ্য। অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় সে চারজনের কাজ একা করত, কাজ চলত তার তরতরিয়ে। তার লাঙল চালান দেখতেও আনন্দ ছিল। তার প্রকাণ্ড মুঠোয় যখন লাঙলের মুঠি চেপে ধরত তখন মনে হত যেন সে ঘোড়ার সাহায্য ছাড়াই মাটির টানটান বুক চিরে যাচ্ছে; সেণ্ট পিটার দিবসে তার কাস্তে চলত এত জোরে যে মনে হত সে এক ঝাড় চারা বার্চগাছ শিকড় ঘেঁষে কেটে ফেলতে পারে, কিম্বা যখন সে মাড়াই উঠোনে দ্রুততালে তার ইয়া লম্বা মুগুর পিটত অক্লান্ত তখন তার কাঁধের লম্বা শক্ত পেশীগুলো যেন জাঁতীকলের মতো ওঠানামা করত। অবিরাম নীরবতায় তার অক্লান্ত পরিশ্রমে ফুটে উঠত একটা বিজয়ী গাম্ভীর্য। মরদ ছিল সে খাসা, তার ঐ খুঁতটুকু না থাকলে যে কোন মেয়ে তাকে বিয়ে করতে পেলে খুশী হত...কিন্তু গেরাসিমকে নিয়ে যাওয়া হল মস্কোতে, কিনে দেওয়া হল এক জোড়া হাই বুট, তৈরী হল তার গ্রীষ্মের জন্যে কামিজ আর শীতকালের জন্যে ভেড়ার চামড়ার কোট। হাতে দেওয়া হল ঝাড়ু আর বেলচা এবং করে দেওয়া হল তাকে জমাদার।

প্রথমে তার নতুন জীবন বড়ই খারাপ লাগত। ছোট থেকেই সে মাঠের কাজ আর গ্রামের জীবনেই অভ্যস্ত। আপন বিকলাঙ্গতার জন্যে মানুষের সঙ্গ ছাড়া হয়ে সে বেড়ে উঠেছিল বিশাল ও নির্বাক, যেন সরেস মাটিতে একটা মহীরুহ...

তাকে যখন শহরে আনা হল সে বুঝতে পারছিল না তার কি ঘটছে, যেমন বোঝে না বুক-

সমান উঁচু ডগডগে ঘাসে ভরা মাঠ থেকে ধরে আনা একটা তাজা তাগড়াই ষাঁড়, ধরে এনে যাকে তুলে দেওয়া হয়েছে রেলগাড়িতে, তারপর কখনো ফুলকি-ভরা ধোঁয়া কখনো বাষ্পের কুন্ডলীর মধ্য দিয়ে তার প্রকান্ড দেহটাকে ঝকঝক শব্দে আর বাঁশির আওয়াজে ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভগবানই জানেন কোথায়!

ক্ষেত-খামারে কঠিন পরিশ্রমের কাজের পর তার নতুন চাকরীতে গেরাসিমকে যে কাজ করতে হত তা তার কাছে ছিল হাস্যকর; আধঘণ্টার মধ্যে সে তার কাজ সেরে ফেলে বাকি দিনটা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পথচারী লোকদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কাটাত, যেন তাদের মুখের চেহারা থেকে তার এই গোলমেলে অবস্থার একটা মানে খুঁজে পেতে চাইত। কখনো বা সে একটা কোণে গিয়ে ঝাড়ু আর বেলচা দূরে ছুড়ে ফেলে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ — ঠিক যেন একটা কলে-পড়া জন্তু। কিন্তু মানুষের সবই সয়ে যায় এবং গেরাসিমেরও শেষ পর্যন্ত শহুরে জীবন সয়ে এল। তার কাজ ছিল খুব কম; দায়িত্ব বলতে শুধু উঠোন পরিষ্কার রাখা, দিনে দুবার পিপে ভরে জল আনা, রান্নাঘর আর বাড়ির জন্যে কাঠ ফাড়া, অজানা লোকদের উঠোনে ঢুকতে না দেওয়া আর রাত্রে চৌকি দেওয়া। একথা মানতেই হবে যে সে তার কর্তব্য প্রাণপণে পালন করত: উঠোনের ওপর কখনও কোনো আবর্জনা, এমনকি একটি কুটোও পড়ে থাকত না; জলের পিপে বয়ে আনবার জন্যে তাকে যে ডিগডিগে ঘোড়ায় টানা গাড়িটা দেওয়া হয়েছিল তার চাকা দুর্যোগের মধ্যে কোথাও আটকে গেলে সে কেবল এক কাঁধ দিয়ে মারত এক ঠেলা আর গাড়িঘোড়া একসঙ্গে গড়গড় করে এগিয়ে যেত; যখন সে কাঠ চেলাত তখন কাচের মতো ঝনঝন করত তার কুড়ুল, কাঠের কুঁদো আর কুচি ছুটত চারদিকে; অজানা লোক আসবে কি, সেই যে এক রাত্রে সে দুটো চোর ধরে তাদের মাথায় মাথায় এমন জোরে ঠুকেছিল যে তাদের আর থানায় নিয়ে যাবার মোটেই দরকার হয় নি — তখন থেকে আশপাশের লোকের কাছে তার সম্মান খুব বেড়ে যায়। এমনকি দিনের বেলাতেও চোর-ছ্যাঁচড় নয়, স্রেফ অচেনা কোনো লোকে যদি আসত, তাহলে ঐ ভয়াবহ চৌকিদারের চোখে পড়ামাত্র প্রাণপণে হাত নাড়ত আর চীৎকার করত, যেন সে কতই শুনতে পাচ্ছে ওরা কি বলছে। বাড়ির অন্য চাকরবাকরের সঙ্গে গেরাসিমের সম্পর্কটা ঠিক বন্ধুত্বের ছিল না — তারা ওকে ভয় করত — তবে সহজ ছিল, ও তাদের আপন বলেই ভাবত। ইঙ্গিতে ভাববিনিময় হলেও ও তাদের কথা বুঝতে পারত, সমস্ত আদেশ ঠিক ঠিক পালন করত, কিন্তু নিজের অধিকার সম্বন্ধেও সে সচেতন ছিল, টেবিলে তার জায়গাটিতে বসতে কারো সাহস হত না। মোটের ওপর গেরাসিম ছিল গম্ভীর কড়া স্বভাবের লোক, নিয়মশৃঙ্খলার ভক্ত ছিল; মোরগগুলো পর্যন্ত তার সামনে লড়াই করতে ভয় পেত, ওর চোখে পড়লেই সর্বনাশ! অমনি তাদের ঠ্যাং ধরে উঁচুতে বোঁবোঁ করে ঘুরিয়ে দূরে ছুড়ে দেবে। কর্ত্রীর উঠোনে হাঁসও থাকত বটে। তবে সবাই জানে হাঁসরা কেমন বিবেচক, ভারিক্কি জাতের জীব; তাই গেরাসিম তাদের সম্ভ্রমের চোখে দেখত, যত্ন নিত, খাওয়াত; নিজেও সে ছিল একটি সম্ভ্রান্ত হাঁসের মতো। রান্নাঘরের ওপরে একটি ছোট্ট কামরা তার থাকার জন্যে বরাদ্দ হয়েছিল; সেটা সে গুছিয়ে নেয় নিজের পছন্দমত; চারটে কাঠের কুঁদোর ওপর ওক-তক্তা দিয়ে নিজের খাট বানিয়ে নেয়, সত্যিই

সে এক দৈত্যের শোবার মতো বিছানা; তাতে একশ মণ ভার চাপালেও একটু ঝুলে পড়ত না; বিছানার নীচে ছিল একটা শক্ত বাক্স; এক কোণে তেমনি জবরদস্ত এক টেবিল আর টেবিলের ধারে একটা তেপায়া টুল। সেটা আবার এমনি নিচু আর নিরেট মজবুত যে গেরাসিম নিজেই কখনো কখনো সেটাকে ওপরে তুলে ছেড়ে দিত আর হেসে খুন হত। ঘরের দরজা বন্ধ করা হত এক প্রকান্ড তালা দিয়ে, দেখতে এক তাল রুটির মতো, শুধু রংটা কালো। তার চাবি সর্বদা থাকত গেরাসিমের কোমরবন্ধে। কেউ তার ঘরে যায় এ তার মোটেই পছন্দ ছিল না।

২

এক বছর শহরে বাস করার পর গেরাসিমের জীবনে এল এক ছোট অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

যাঁর কাছে সে জমাদারের কাজ করত সেই বৃদ্ধা জমিদারণী ছিলেন পুরাতন প্রথার বড় ভক্ত এবং বহু পরিচারক রেখেছিলেন: তাঁর বাড়িতে শুধু ধোপানী, মেয়ে-দরজী, পুরুষ-দরজী, ছুতোর, পোশাক বানানেওয়ালা, এরাই থাকত না, আরো থাকত ঘোড়ার জিনকার, তাকে ধরা হত গরু-ঘোড়ার ওঝা এবং চাকরবাকরদের বৈদ্য। তাঁর নিজের জন্যে একজন বাঁধা খাস ডাক্তার ছিল এবং সর্বোপরি ছিল কাপিতন ক্লিমভ্ নামে এক পাঁড় মাতাল, সে জুতো তৈরী করত। ক্লিমভ নিজের সম্বন্ধে মনে করত যে তার প্রতি অবিচার হয়েছে, তার গুণের কদর হয় নি: তার মতো একজন শিক্ষিত শহুরেকে কিনা অযথা থাকতে হচ্ছে কী এক অজ পাড়া-গাঁয়ে, আর মদ যে খায়, যা সে থেমে থেমে বুক চাপড়ে বলত, সেটা শুধু দুঃখ ভুলে থাকার জন্যে। একদিন ঠাকরুণের সঙ্গে বাজার-সরকার গাভ্রিলার আলাপের সময় তার কথা উঠল। গাভ্রিলার হলদেপানা চোখ আর পাতিহাঁসের ঠোঁটের মতো চ্যাপ্টা নাক দেখে মনে হত পদস্থ লোক হওয়াই তার ভাগ্যের নির্বন্ধ। কর্ত্রী ঠাকরুণ কাপিতনের দুশ্চরিত্রতার জন্যে দুঃখ করছিলেন — তার আগের দিনই তাকে রাস্তায় পাওয়া গিয়েছিল বেহেড মাতাল অবস্থায়।

হঠাৎ তিনি বললেন, 'আচ্ছা, ওর যদি বিয়ে দিয়ে দিই, গাভ্রিলা? তুমি কি বলো? হয়ত তাহলে শোধরাবে।'

গাভ্রিলা বলল, 'আজ্ঞে, তা বিয়ে না দেবার কী আছে। দিলেই হয় আজ্ঞে। বলতে কি, ভালই হবে রাণীমা।'

'হুঁ, কিন্তু ওকে বিয়ে করবে কে?'

'সে তো ঠিক কথা, আজ্ঞে। তবে আপনি যা বলবেন রাণীমা, হাজার হোক, কাজ দিতে পারে— অন্তত, অন্যদের চেয়ে কী এমন বেশি খারাপ।'

'আচ্ছা, তাতিয়ানাকে ওর পছন্দ, তাই না?'

গাভ্রিলা একটু আপত্তি করতে গিয়ে একেবারে ঠোঁট চেপে রইল।

'হ্যাঁ!.. তাতিয়ানাকেই বিয়ে করুক।' এই স্থির করে কর্ত্রী ঠাকরুণ খুশী মনে এক চিমটি নস্যি নিয়ে বললেন, 'বুঝলে?'
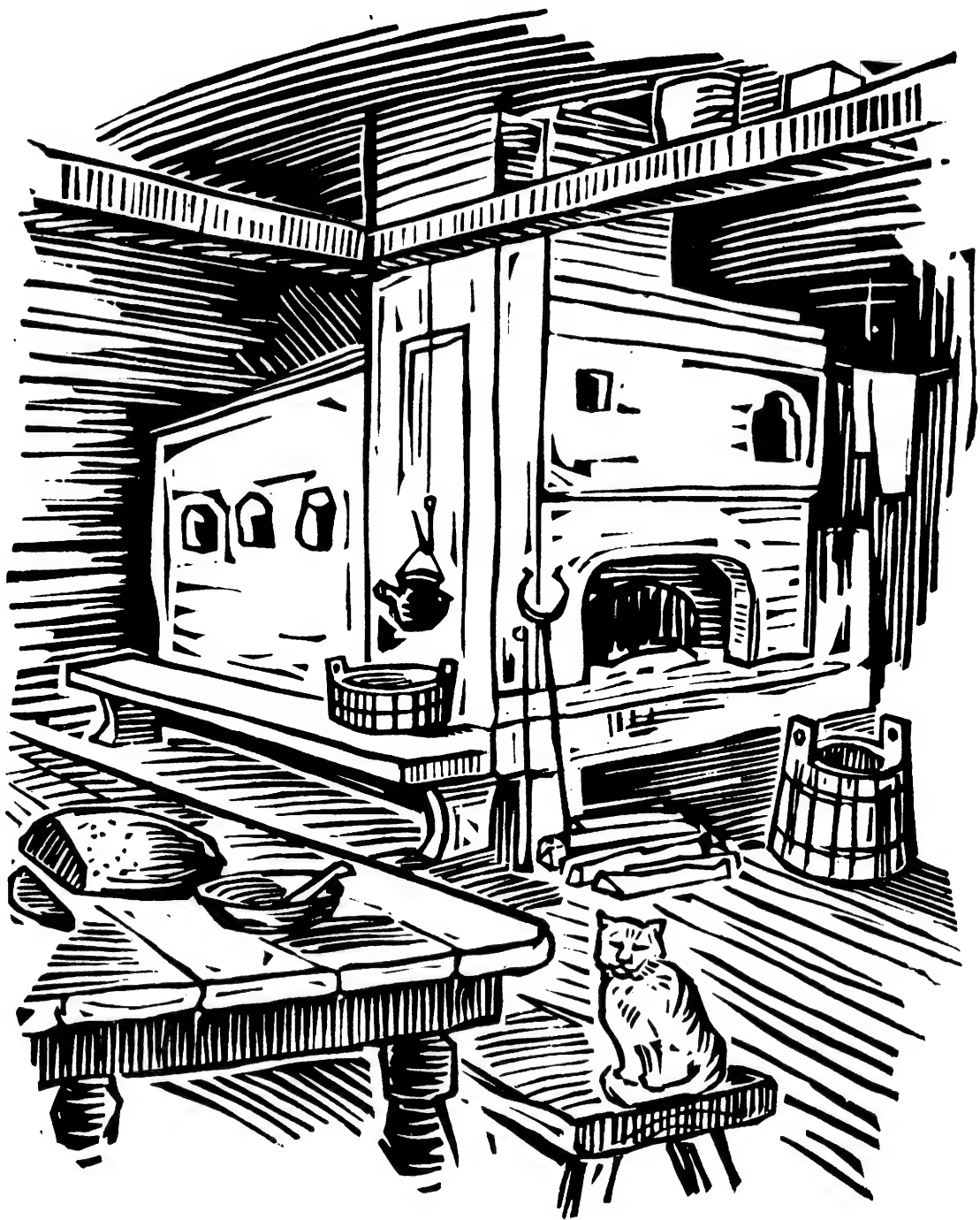
'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাণীমা,' বলেই গাভ্রিলা সরে পড়ল।

তার নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে (ঘরটা ছিল বাড়িটার একটেরে আর লোহাবাঁধান সিন্দুকে ভর্তি) গাভ্রিলা প্রথমই বৌকে সে-ঘর থেকে বিদেয় করে জানলার কাছে বসে ভাবতে লাগল। বোঝা যায় কর্ত্রীর আচমকা হুকুম তাকে শঙ্কিত করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত উঠে সে কাপিতনকে ডেকে পাঠাল। কাপিতন এল... কিন্তু পাঠকদের এই দু'জনের কথাবার্তা বলার আগে, যে তাতিয়ানার সঙ্গে বিয়ের কথা সে কে এবং কেন ঠাকরুণের হুকুমে গাভ্রিলা বিব্রত হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা অন্যায় হবে না।

তাতিয়ানা ছিল ধোপানীদের একজন, কিন্তু কাজে সে এত নিপুণ আর অভিজ্ঞ যে তাকে শুধু সবচেয়ে মিহি কাপড় কাচতে দেওয়া হত। তার বয়েস প্রায় আটাশ, মাথায় ছোট, রোগা, শণের মতো চুল আর বাঁ গালে ছিল তিল। রাশিয়াতে বাঁ গালে তিল বড় অলক্ষুণে; মনে করা হয় ওতে জীবন অসুখী হবে... সৌভাগ্যের বড়াই তাতিয়ানার ছিল না। অতি অল্প বয়েস থেকেই লাথি-ঝাঁটা খেয়ে সে মানুষ, একা দু'জনের সমান কাজ করেছে এবং কখনো কারো কাছ থেকে স্নেহের ছিটে ফোঁটাও পায় নি; পোশাক-আশাক তার বিশেষ জোটে নি, মাইনেও নেহাৎ কম; বলতে গেলে তার আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না: কেবল এক বুড়ো ভাঁড়াড়ী হয় তার খুড়ো, এখন অকেজো বলে গাঁয়ে পড়ে আছে, আর গোটাকয়েক চাষাভুষো কাকা কিম্বা মামা, তাছাড়া কেউ না। তার বয়েসকালে তাকে সুন্দরী বলা চলত, কিন্তু খুব শিগ্‌গির বেচারী রূপ খুইয়েছিল। স্বভাবটি তার শান্ত, বলতে কি সন্ত্রস্তই, নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং সকলের ভয়ে নিদারুণ ভীত; সময়ে কাজ শেষ করা ছাড়া তার আর কোন চিন্তা ছিল না, কখনো কারো সঙ্গে কথা বলত না, আর কর্ত্রীর নামেই কাঁপত, যদিও তিনি তার মুখ চিনতেন কিনা সন্দেহ। গেরাসিম যখন গাঁ থেকে এল তখন তার প্রকাণ্ড শরীর দেখে বেচারী ভয়ে প্রায় মরে। যতদূর সাধ্য সে তাকে এড়িয়ে চলত, আর যদি কখনো বাড়ি থেকে ধোবিখানা যাবার পথে হঠাৎ তার কাছাকাছি পড়ে যেত তাহলে চোখ পর্যন্ত বন্ধ করে ফেলত। প্রথম প্রথম গেরাসিম ওকে গ্রাহ্য করে নি, কিন্তু পরে ওকে দেখলে হাসত, তারপর তাকিয়ে থাকতে লাগল ওর দিকে, এবং শেষাশেষি তাতিয়ানার কাছ থেকে চোখ আর আদপেই ফেরাত না। তাতিয়ানাকে তার ভালো লেগেছিল তার নিরীহ মুখ নাকি তার ভীরু আনাগোনা দেখে, ভগবান জানেন! একদিন যখন সে কর্ত্রীর একটা মাড় দেওয়া খড়খড়ে ব্লাউজ সযত্নে আঙুলে ধরে উঠোন পার হচ্ছিল তখন কে যেন তার কনুইটা চেপে ধরল। ফিরে তাকিয়েই সে চীৎকার করে উঠল: পেছনে দাঁড়িয়ে গেরাসিম। বোকা বোকা হাসি টেনে সোহাগে ব্যা-ব্যা শব্দ করে সে তার দিকে বাড়িয়ে দিলে একটা সোনালি ল্যাজ আর ডানাওয়ালা মোরগের মতো দেখতে একরকমের কেক। না-বলবার আগেই সেটাকে ওর হাতে জোর করে গুঁজে এগিয়ে গেল, তারপর মাথা ফিরিয়ে বন্ধুর মতো কী ব্যা-ব্যা করে বললে। সেইদিন থেকে তাতিয়ানার আর রেহাই ছিল না। যেখানে সে সেখানে গেরাসিম — ওর সামনে এগিয়ে আসত হাসতে হাসতে, অদ্ভুত শব্দ করে, হাত নেড়ে, হয়ত বা হঠাৎ শার্টের নীচের থেকে একটা রঙীন ফিতে ফস্‌ করে টেনে জোর করে ওর হাতে গুঁজে দিত, কিম্বা ঝাঁটা দিয়ে ধুলো ঝেড়ে দিত তার সামনে থেকে।

বেচারা মেয়েটি মোটে ভেবে পেত না কি করবে। শিগ্‌গিরই বাড়ির সমস্ত লোক বোবা জমাদারের কান্ডকারখানার কথা জেনে ফেলল; তাতিয়ানার ওপর চলল ঠাট্টা, টিট্‌কিরি আর হুল ফোটানো কথার বৃষ্টি। কিন্তু গেরাসিমকে ঠাট্টা করার মতো সাহস কারো ছিল না: সে ঠাট্টা পছন্দ করত না; আর তার সামনে তাতিয়ানাকেও কেউ জ্বালাতন করত না। বেচারীর পছন্দ হোক আর না হোক, গেরাসিম তার রক্ষাকর্তার মতো হয়ে উঠল। সব বোবাকালার মতোই ওর অনুভূতি ছিল টনটনে। ওদের দু'জনের কাউকে নিয়ে লোকে হাসিঠাট্টা করলে ঠিক বুঝতে পারত। একদিন খাওয়ার সময় তাতিয়ানার ওপরওয়ালী ঝি তার পেছনে লেগে এমন খোঁচাতে লাগল যে বেচারী ভেবে পায় না কি করবে, দুঃখে তার চোখে প্রায় জল এসে গেল। হঠাৎ গেরাসিম উঠে দাঁড়িয়ে তার মস্ত হাতের থাবাখানা বাড়িয়ে সেই মেয়েটার মাথায় রেখে তার মুখের দিকে এমন কটমট করে তাকাল যে সে একেবারে কুঁকড়ে গেল। কেউ একটা কথা বলল না। গেরাসিম তার চামচে আবার তুলে নিয়ে সুপ খেতে লাগল। সবাই চাপা গলায় বিড়বিড় করলে, 'বোবা শয়তান! অসুর একেবারে!' আর সেই মেয়েটা উঠে চলে গেল চাকরানিদের ঘরে।

আর একবার কাপিতন — যে কাপিতনের কথা বলছিলাম — তাতিয়ানার সঙ্গে বড় বেশি-মাখামাখি আলাপ জুড়েছে দেখে গেরাসিম তাকে আঙুল নেড়ে ডেকে নিয়ে যায় গাড়ি রাখার ঘরে, সেখানে কোণ থেকে একটা বম তুলে নিয়ে সামান্য যেটুকু শাসিয়ে দিয়েছিল তাই যথেষ্ট। এর পর আর কেউ তাতিয়ানার সঙ্গে গল্প করত না। এ সবে কিন্তু গেরাসিমের কোনো শাস্তি হত না। সেই চাকরানিটি অবশ্যি নিজেদের ঘরে গিয়েই মূর্ছা যায় এবং সাধারণভাবে এমন নিপুণ সব কান্ডকারখানা করে যে গেরাসিমের জবরদস্তির কথা সেই দিনই কর্ত্রীর কানে যায়; কিন্তু সেই খামখেয়ালী বৃদ্ধা তাতে কেবল হেসে কুটোপাটি হলেন আর চাকরানিকে চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ করে তিনি বারকয়েক তাকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন কেমন করে গেরাসিম ভারী হাত দিয়ে তার মুণ্ডু নুইয়ে দিয়েছিল, আর পরের দিন তিনি গেরাসিমকে পাঠিয়ে দিলেন একটা রুপোর রুব্‌ল্‌। বিশ্বাসী এবং পালোয়ান চৌকিদার হিসাবে তিনি তার কদর করতেন। গেরাসিম তাঁকে বেশ ভয় করত, তবে তাঁর দয়ার ওপর ভরসাও রাখত; সে তোড়জোড় করছিল তাঁর কাছে গিয়ে তাতিয়ানাকে বিয়ে করবার অনুমতি চাইবে। কেবল সে অপেক্ষা করছিল, বাজার-সরকার তাকে যে নতুন জামা দেবে বলেছিল সেইটে পাবার, যাতে সে ভব্য চেহারায় কর্ত্রীর সামনে হাজির হতে পারে। এমন সময় তাঁর মাথায় ঢুকল তাতিয়ানার সঙ্গে কাপিতনের বিয়ে দেবার কথা।

কর্ত্রী ঠাকরুণের সঙ্গে কথাবার্তার পর বাজার-সরকার গাভ্রিলার অস্বস্তির কারণটা পাঠক এখন সহজেই বুঝতে পারবেন। জানলার কাছে বসে বসে সে ভাবছিল: 'কর্ত্রী ঠাকরুণ গেরাসিমকে অবশ্যই পছন্দ করেন (গাভ্রিলা এটা ভাল করেই জানত আর সেই জন্যে সে নিজেও তাকে প্রশ্রয় দিত), তাহলেও, ও যে একটা বোবা প্রাণী; আমি তো আর কর্ত্রীকে বলতে পারি না যে গেরাসিম তাতিয়ানার প্রেমে পড়েছে। তাছাড়া এও তো ঠিক, ও আবার কি রকম স্বামী হবে? কিন্তু দত্যিটা যদি টের পায় যে তাতিয়ানার বিয়ে হবে কাপিতনের সঙ্গে তাহলে সমস্ত বাড়িটা ভেঙে তছনছ

করবে — বাপ রে! ওকে তো আর বোঝান যাবে না! ওই ভূতটাকে — কুকথার জন্যে ভগবান আমায় মাপ করুন — ও যে কোন বিচারের কথাই শুনবে না, কিছুতে না...'

কাপিতন আসাতে গাভ্রিলার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। ফুর্তিবাজ জুতো-সেলাইওয়ালা ভেতরে ঢুকে, হাত দুখানা পেছনে করে, গা এলিয়ে দরজার কাছে দেয়াল ঠেস দিয়ে ডান পা'টা বাঁ পায়ের ওপর আড়াআড়ি চাপিয়ে মাথা ঝাড়া দিলে। ভাবখানা এই: 'এই তো আমি এসেছি, কি চাও আমার কাছে?'

গাভ্রিলা কাপিতনকে তাকিয়ে দেখে জানলার ধারিতে আঙুলের টোকা মেরে চলল। কাপিতন তার ঘোলাটে চোখদুটো শুধু একটু কোঁচকাল কিন্তু দৃষ্টি নামাল না; খোঁচা খোঁচা শণের মতো চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে সে বরং একটু হাসল। যেন বলতে চায়: 'এই তো আমি দাঁড়িয়ে, ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছ কেন?'

'খাসা লোক,' বলে একটু থামল গাভ্রিলা, 'খাসা লোক যা হোক!'

কাপিতন খালি কাঁধটা একটু নাড়াল আর মনে মনে বলল: 'তুমি নিজে কি কিছু ভাল নাকি?'

'তাকিয়ে দেখ, একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ,' ভর্ৎসনা করে গাভ্রিলা বলে চলল, 'কী করেছ চেহারাখানা?'

কাপিতন শান্ত দৃষ্টিতে তার পুরানো ছেঁড়া কোট, তালিমারা পেণ্টুলন, ছেঁড়া জুতো — বিশেষ করে যে পা'টির ডগার ওপরে তার ডান পাখানা অমন কায়দা করে চাপান ছিল — এই সবের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল:

'তাতে হয়েছে কি?'

'তাতে হয়েছে কি?' গাভ্রিলা পুনরুক্তি করল, 'হ্যাঁ, হয়েছে কি? আবার বলে কিনা, কি হয়েছে? তোমায় দেখাচ্ছে ঠিক ভূতের মতো — কুকথার জন্যে ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন — হ্যাঁ, একেবারে ভূত।'

কাপিতন খুব তাড়াতাড়ি চোখ পিট্‌পিট্ করে ফের মনে মনেই বলল: 'দাও, গাল দিয়ে যাও গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচ, গাল দাও।'

গাভ্রিলা ফের শুরু করল, 'এই তো তুমি আবার মাতাল হয়েছিলে। ফের মাতাল! এ্যাঁ? জবাব দাও।'

'স্বাস্থ্য খারাপ বলে একটু সুরাজাতীয় জিনিস খেয়েছিলাম, ঠিকই।' কৈফিয়ৎ দিলে কাপিতন।

'স্বাস্থ্য খারাপ না আরো কিছু!.. আসলে তোমায় আচ্ছা করে ধোলাই দিতে হয়, বুঝেছ! পিটার্সবুর্গে নাকি আবার বিদ্যে চর্চা করেছে... ভালোই বিদ্যে হয়েছে। খামোকা ভাত গিলছ।'

'ও কথা যদি বলেন, গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচ, একমাত্র ভগবানই আমার বিচার করবেন — আর কেউ নয়। তিনিই জানেন আমি এ জগতে কি রকম লোক, খামোকাই ভাত গিলছি কিনা। আর মাতাল হবার কথা যে বলছেন — ওতে এবার আমার দোষ ছিল না। আমার এক বন্ধু আমাকে ফুসলিয়ে নিয়ে যায়, তারপর চাল খেলল, মানে ফেলে পালাল আর কি, আর আমি...'

'আর তুমি রাস্তায় পড়ে রইলে, গাধা কোথাকার! ইস, একেবারে গোল্লায় গেছ। যাক গে, তবে

শুধু এই জন্যেই ডাকি নি,' বলে চলল বাজার-সরকার, 'শোন। কর্ত্রী ঠাকরুণ...' এই অবধি বলে একটু চুপ করে রইল, 'কর্ত্রী ঠাকরুণ চান যে তুমি বিয়ে কর। শুনলে? তিনি মনে করেন তুমি বিয়ে করলেই শোধরাবে। বুঝেছ?'

'না বোঝার কী আছে, আজ্ঞে।'

'বেশ, তাহলে আমার মতে তোমার একটা শক্ত হাতে পড়া দরকার। তবে এটা ওঁদের মাথাব্যথা। তাহলে? রাজী?'

কাপিতন দাঁত কেলালে।

'পুরুষের বিয়ে করাটা ভালই, গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচ। আর আমার কথা যদি বলেন, আমি সানন্দে রাজী।'

'ঠিক আছে,' বলে বাধা দিয়ে গাভ্রিলা মনে মনে ভাবল: 'লোকটা গুছিয়ে কথা কইতে পারে বটে।' তারপর শুনিয়ে বলল, 'শুধু ব্যাপার হল, তোমার জন্যে যে কনে বেছেছেন সেটি সুবিধের নয়...'

'কে, একটু কৌতূহল মেটান...'

'তাতিয়ানা।'

'তাতিয়ানা?'

বলেই কাপিতন চোখ বড়ো বড়ো করে দেয়াল থেকে সরে গেল।

'আরে, আঁতকে উঠলে যে? কেন, তাকে পছন্দ নয়?'

'পছন্দ কেন হবে না, গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচ! বেশ মেয়ে, খাটিয়ে, শান্তশিষ্ট... তবে আপনি তো ভাল করেই জানেন, গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচ, ওইটা, ওই ভূতটা, ওই ডাঙ্গালের খোক্ষসটা যে ওর পিছনে লেগে আছে...'

'জানি ভায়া, সবই জানি,' বাজার-সরকার ওকে থামিয়ে দিল বিরক্ত হয়ে, 'কিন্তু...'

'দয়া করুন, গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচ! ও যে আমাকে মেরে ফেলবে, হায় ভগবান, মেরেই ফেলবে — একটা মাছি মারা করে, তার যে হাত — আপনি নিজেই গিয়ে দেখুন না তার হাতের বহরখানা, ওর যে স্রেফ মিনিন আর পোজারস্কি* মার্কা হাত। ও যে কালা, তাই মারে কিন্তু কতটা মারল, তা কানেও যায় না! ঠিক যেন ঘুমের ঘোরে হাত চালায়। আর ওকে ঠাণ্ডা করা — সে অসম্ভব; কেন? সে তো নিজেই জানেন, গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচ। ও যে কানে কালা, উপরন্তু নিরেট বোকা। ও যে একটা বুনো জানোয়ার, একটা কালা-পাহাড় — তার চেয়েও খারাপ — একটা নিরেট কাঠের কুঁদো! ওর হাতে আমায় মার খেতে হবে কেন? অবিশ্যি আমার এখন আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না। টাকা-কড়ি নেই, জামা-জুতো নেই, দেনায় ডুবে আছি, এখন একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ির মতো ফ্যালনা। কিন্তু হাজার হলেও আমি মানুষ তো, সত্যিই একটা ভাঙা হাঁড়ি নই।'

---

* সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রুশদেশ আক্রমণকারী পোল'দের বিরুদ্ধে এই দুই অতি পরাক্রান্ত নেতা অদ্ভুত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাস্ত করেছিলেন। — সম্পাঃ

'জানি, জানি, বাখানি করতে হবে না...'

'হে ভগবান!' আকুল হয়ে বলতে লাগল কাপিতন, 'কবে যে এ সব চুকবে? কখন, হে ভগবান? কি হতভাগা আমি! কপাল আমার... দ্যাখো দিকি, কী আমার কপাল! ছেলেবেলায় মার খেয়েছি আমার জার্মান মনিবের হাতে, আমার জীবনের সেরা সময়ে আমার দেশের লোকের হাতে আমায় মার খাওয়াত। আজ এতখানি বয়সে কী আমার দশা...'

'তুমি একটা কিস্যু না,' গাভ্রিলা বলল, 'সত্যি বাপু, বড়ো প্যানপ্যান জুড়েছ!'

'কী বলছেন, গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচ? মারের ভয় আমি করি না। মালিক আমায় মারুন না আড়ালে, ঘরের ভেতরে, কিন্তু লোকের সামনে আমার ইজ্জৎটা থাক, আমিও তো একটা মানুষ। কিন্তু এ কার হাতে আমায়...'

'ঢের হয়েছে। যাও, ভাগো!'. তাকে থামিয়ে দিয়ে অধীরভাবে চেঁচিয়ে উঠল গাভ্রিলা।

গুটিগুটি চলে গেল ক্লিমভ।

'আচ্ছা, ধরা যাক ও নেই, তাহলে রাজী হবে?' গাভ্রিলা পেছন থেকে হেঁকে বলল।

'সর্বান্তঃকরণে,' বলে চলে গেল কাপিতন।

আপৎকালেও তার বাহারে কথার কমতি ছিল না।

বাজার-সরকার ঘরের মধ্যে বারকয়েক পায়চারি করল।

'আচ্ছা, এখন তাতিয়ানাকে ডেকে দাও,' অবশেষে বলল সে।

মিনিটকয়েক পরে তাতিয়ানা প্রায় নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়াল চৌকাটের কাছে।

মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচ?'

গাভ্রিলা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'আচ্ছা, তাতিয়ানা, বিয়ে করবে? রাণীমা তোমার জন্যে একটি পাত্র স্থির করেছেন।'

'আজ্ঞে, গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচ,' সে বলল। তারপর ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আমার জন্যে তিনি কোন পাত্র স্থির করেছেন?'

'কাপিতন জুতো-সেলাইওয়ালা।'

'আজ্ঞে।'

'ও একটু বেসামাল লোক, তা ঠিকই। কিন্তু এ বিষয়ে রাণীমা তোমার ওপর ভরসা করছেন।'

'আজ্ঞে।'

'কেবল ঐ বোবা গেরাসিমটাকে নিয়েই যত বিপদ... সে যে আবার তোমার সঙ্গে প্রেম করছে। ঐ ভালুকটাকে তুমি তুক করলে কি দিয়ে? এমন ভালুক ও যে তোমায় মেরেই ফেলবে...'

'মেরেই ফেলবে, গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচ, নিশ্চয় মেরে ফেলবে।'

'মেরে ফেললেই হল?.. দেখে নেব আমরা। বলছ কিনা খুন করে ফেলবে? ওর কি অধিকার আছে খুন করবার? নিজেই ভেবে দ্যাখো।'

'কে জানে, গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচ, অধিকার আছে কি নেই।'

'বেশ মেয়ে তো তুমি! ওকে কিছু কথা দাও নি তো?..'

'কি বললেন, আজ্ঞে?'

একটু চুপ করে বাজার-সরকার ভাবলে: 'বড়োই তুই অবোলা জীব!' তারপর বলল, 'বেশ, পরে আবার কথা হবে। এখন যাও, তান্যুশা, দেখতে পাচ্ছি ভারী তুমি বাধ্য।'

তাতিয়ানা ফিরে গেল। ঘর থেকে বেরোবার সময় দরজাটা আলতোভাবে ছুঁয়ে গেল।

বাজার-সরকার ভাবলে: 'হয়ত কালকের মধ্যেই কর্ত্রী ঠাকরুণ এ বিয়ের কথা ভুলে যাবেন। আমার এত ভয় কিসের? গুণ্ডাটার একটা ব্যবস্থা করা যাবে — দরকার হলে পুলিসে দেব...' তারপর চেঁচিয়ে তার স্ত্রীকে ডাকল, 'উস্তিনিয়া ফিওদরভ্না, সামোভারটা গরম কর তো লক্ষ্মী...'

তাতিয়ানা সমস্তদিন কাপড়-কাচার ঘর থেকে বেরোলই না। প্রথমে সে একটু কাঁদল, কিন্তু শিগ্‌গিরই চোখের জল মুছে আগের মতোই কাজে লাগল।

ইতিমধ্যে কিন্তু বাজার-সরকার যা আশা করেছিল তা হল না। কাপিতনের বিয়ের চিন্তা বৃদ্ধাকে এমন পেয়ে বসেছিল যে তিনি সে রাত্রে তাঁর এক আশ্রিতার সঙ্গে এ ছাড়া আর কোন কথা বললেন না। এই আশ্রিতাকে বাড়িতে রাখা হয়েছিল শুধু কর্ত্রীর অনিদ্রার সময় তাঁর সঙ্গ দানের জন্যে, দিনের বেলায় সে ঘুমোত যেন রাতের গাড়োয়ান। চা খাওয়ার পর গাভ্রিলা যখন কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেল তাঁর প্রথম প্রশ্ন হল, 'বিয়ের তোড়জোড় কেমন এগোচ্ছে?' সে অবশ্য জবাবে বলল যে খাসা এগিয়ে চলেছে, এবং কাপিতন সেই দিনই তাঁকে সেলাম জানাতে আসবে। কর্ত্রীর শরীর খুব ভাল লাগছিল না এবং তিনি বেশিক্ষণ কাজের কথায় ব্যস্ত রইলেন না। বাজার-সরকার তার নিজের ঘরে ফিরে এক বৈঠক ডাকল। ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ আলোচনা দরকার। তাতিয়ানা অবশ্য কোন আপত্তি তোলে নি, কিন্তু কাপিতন সকলকে শুনিয়ে বলল যে তার ঘাড়ে মাথা তো মোটে একটি, দুটো কি তিনটে নয়... গেরাসিম দ্রুত কড়া চোখে সবাইয়ের দিকে চাইলে, চাকরানিদের ঘরের বারান্দা থেকে নড়লই না, মনে হল যেন সে টের পেয়েছে যে তার বিরুদ্ধে অশুভ একটা কিছু পাকান হচ্ছে। জমায়েৎ দলের মধ্যে ছিল একজন বুড়ো বাবুর্চি, ডাকনাম 'লেজা' খুড়ো, তার কাছে সর্বদাই খাতির করে পরামর্শ চাওয়া হত, যদিও কখনো সে 'বটে!' আর 'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' ছাড়া বেশি কিছু বলত না। ওরা তো প্রথমেই নিরাপত্তার জন্যে কাপিতনকে জল ফিল্টার করার কুঠরীতে তালাবন্ধ করে দিল, তারপর গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হল। অবিশ্যি গায়ের জোরে কাজ সারা সহজ ব্যাপার, কিন্তু ভগবান না করুন! কর্ত্রীর কানে যদি গোলমাল পেঁছয় তাহলে ভীষণ কাণ্ড হবে! কী করা যায়? অনেক ভেবে ভেবে তারা একটা সিদ্ধান্ত করল। প্রায়ই লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে গেরাসিম মাতাল মোটে দেখতে পারত না... ফটকের কাছে বসে থাকবার সময় সে যদি দেখত কেউ একটু বেশি মদ খেয়ে টলমলে পায়ে টুপিটা কানের ওপর টেনে তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে তাহলে সে সর্বদাই রেগে মুখ ফিরিয়ে নিত। স্থির হল যে তাতিয়ানাকে শেখান হবে মাতলামির ভান করে টলতে টলতে গেরাসিমের পাশ দিয়ে যেতে। বেচারা মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরে রাজী হয় নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মত করান হল। আসলে সে নিজেই বুঝতে পারছিল যে তার ভক্তটির হাত এড়াবার আর কোন উপায় নেই। চলে গেল তাতিয়ানা। কাপিতনকেও কুঠরী থেকে ছেড়ে দেওয়া হল: হাজার হোক, ব্যাপারটা তো তাকে নিয়েই। গেরাসিম ফটকের

কাছে একটা টুলের ওপর বসে বসে বেলচা দিয়ে মাটিটা খোঁচাচ্ছিল... আর যত আনাচ-কানাচ থেকে, সমস্ত জানলার পর্দার আড়াল থেকে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল সবাই।

ফন্দিটা কাজে লাগল পুরোপুরি। তাতিয়ানাকে দেখে প্রথমে গেরাসিম মাথা নেড়ে আগের মতো আদরের ব্যা-ব্যা শব্দ করেই, তারপর হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বেলচাখানা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে কাছে এসে নিজের মুখটা নিয়ে এল একেবারে তাতিয়ানার মুখের কাছে... ভয়ের চোটে বেচারী আরো টলতে টলতে চোখ বুজে ফেলল... তার হাত ধরে গেরাসিম হিড়হিড় করে উঠোনের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে যে ঘরে সবাই জটলা করছিল সেইখানে একেবারে কাপিতনের কাছে ঠেলে দিল। তাতিয়ানার তো মূর্ছা যাবার উপক্রম... গেরাসিম মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকাল, তারপর একটা দূরছাই ভঙ্গি করে তিক্ত হেসে দুম্‌দাম্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকল নিজের কোটরে। সারাদিন সারারাত সেখান থেকে বেরোল না। আন্তিপ্‌কা সহিস পরে বলেছিল যে দেয়ালের ফুটো দিয়ে সে দেখেছে যে গেরাসিম হাতে মুখ রেখে বিছানার ওপর বসে আছে আর আস্তে করে, তালে তালে, কেবল মাঝে মাঝে ব্যা-ব্যা করে যেন গান গাইছে, অর্থাৎ কচুয়ান কিম্বা গুণটানা মাল্লারা তাদের দুঃখের গান গাইবার সময় যা করে সেইভাবে দুলছে আর চোখ বুজে মাথা নাড়ছে। দেখে আন্তিপ্‌কার রক্ত হিম হয়ে যায়, ফুটো থেকে পালিয়ে আসে সে। পরের দিন যখন গেরাসিম তার কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এল তখন তার মধ্যে কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল না। মনে হল যেন কেবল আরো গোমড়া, কাপিতন কিম্বা তাতিয়ানার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। সেই দিনই সন্ধ্যায় তারা দু'জনে কর্ত্রীর কাছে গেল এক একটা হাঁস বগলদাবা করে, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দিনও গেরাসিমের ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেল না; কেবল নদী থেকে সে ফিরল জল না নিয়েই — কি জানি কেমন করে রাস্তায় পিপেটা ভেঙে গিয়েছিল; আর রাত্রে আস্তাবলে তার ঘোড়াটার ওপর এমনি কষে দলাই-মলাই চালাল যে সেটা হাওয়ার মুখে শরের মতো থরথর করতে লাগল আর তার লোহার মতো হাতের চাপে একবার এপায়ে একবার ওপায়ে ভর দিয়ে টলে টলে পড়ল।

৩

এ সব ঘটনা ঘটেছিল বসন্তকালে। আর একটা বছর কাটল। এর মধ্যে কাপিতন সম্পূর্ণ মদের দাস হয়ে পড়ল আর একটা সম্পূর্ণ অকেজো লোক বলে স্ত্রীর সঙ্গে তাকে দূরে গাঁয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল লটবহর সমেত। বিদায়ের দিন সে প্রথমটা ডোন্টকেয়ার ভাব দেখিয়ে হেঁকে বলল যে তাকে যেখানেই পাঠান হোক, এমনকি যত পাণ্ডববর্জিত দেশই হোক না কেন, তার কিছু এসে যায় না; কিন্তু পরে তার তেজ গেল, ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল তাকে অশিক্ষিত গেঁয়ো লোকদের মাঝে নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে, আর শেষটায় এমন জবুথবু হয়ে পড়ল যে নিজের টুপিটা পর্যন্ত পরতে পারল না। একজন দয়াপরবশ হয়ে সেটার ডগাটা ঠিকঠাক করে ওর মাথার ওপরে

ঘেবড়ে বসিয়ে দিল। যখন সব প্রস্তুত, গাড়োয়ানরা লাগাম বাগিয়ে কেবল 'শুভযাত্রা' কথাটির অপেক্ষা করছে, তখন গেরাসিম তার কোটর থেকে বেরিয়ে গেল তাতিয়ানার কাছে আর একবছর আগে তার জন্যে কেনা একটা লাল সুতী রুমাল তাকে উপহার দিল স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত তাতিয়ানা তার জীবনের সব দুঃখকষ্ট সয়েছিল অপার উদাসীনতায়, কিন্তু আর পারল না; কেঁদে ফেললে, তারপর গাড়িতে উঠে গেরাসিমকে তিনবার চুমু খেল খৃষ্টীয় প্রথায়। গেরাসিমের ইচ্ছে ছিল শহরের ফটক পর্যন্ত সঙ্গে যাবে, তাই গাড়ির পাশে পাশে চলতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ ক্রিম্‌স্কি খেয়াঘাটে থেমে গিয়ে, হাত নেড়ে চলে গেল নদীর ধার বরাবর।

সন্ধ্যা নেমে আসছিল। গেরাসিম জলের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা কি যেন জলের ধারে কাদার মধ্যে হাঁকপাঁক করছে। ঝুঁকে পড়ে সে দেখল একটা সাদার ওপর কালো ফুট্‌কিওয়ালা ছোট্ট কুকুরছানা বৃথাই চেষ্টা করছে জল থেকে ওঠবার; ছটফট করছে, পিছলে পড়ে যাচ্ছে, আর তার লিক্‌লিকে ভিজে শরীরটা কাঁপছে থরথর করে। বেচারীকে দেখে গেরাসিম একহাতে সেটাকে তুলে নিয়ে কামিজের ভেতর গুঁজে হন্‌হন্‌ করে বাড়ি ফিরে এল। নিজের কুঠরীতে ফিরেই সে সদ্য রক্ষা-করা কুকুরছানাটাকে বিছানায় রেখে তার ভারী কোটটা দিয়ে চাপা দিল, তারপর প্রথমে খড়ের জন্যে আস্তাবলে আর একটু দুধের জন্যে রান্নাঘরের দিকে দৌড়ল। খুব সাবধানে কোটটা একটু উল্টিয়ে তলায় খড় বিছিয়ে সে দুধের বাটিটা বিছানার ওপরে রাখল। বাচ্চাটার বয়েস মোটে তিন সপ্তাহ, সবে চোখ ফুটেছে; তার মধ্যে আবার একটা চোখ এখনও অন্যটার চেয়ে বড় দেখাচ্ছে; বাটি থেকে দুধ খেতে শেখে নি এখনও, খালি কাঁপছে আর চোখ পিটপিট করছে। গেরাসিম দুটো আঙুল দিয়ে সন্তর্পণে তার মাথাটা ধরে দুধের মধ্যে তার নাকটা ডুবিয়ে দিল। হঠাৎ কুকুরছানাটা লোভীর মতো চক্‌চক্‌ করে দুধ খেতে আরম্ভ করল; তখনও সেটা কাঁপছে, ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করছে আর মাঝে মাঝে দম আটকে যাচ্ছে। গেরাসিম বসে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ জোরে হেসে উঠল... সারারাত সেটার যত্ন নিল, শোয়াল, গা মুছিয়ে দিল; তারপর তারই পাশেই ঘুমিয়ে পড়ল কী একটা মৃদু আনন্দের স্বপ্নে।

গেরাসিম তার নতুন আশ্রিতাটির এমন যত্ন নিতে লাগল যা কোন মা করে না তার শিশুসন্তানের জন্যে। কুকুরটা দেখা গেল মাদী। প্রথমে সেটা ছিল যেমন দুর্বল তেমনি রুগ্ন আর কুচ্ছিৎ দেখতে, কিন্তু পরে একটু করে সেরে উঠল, গায়েও মাংস লাগল, আর মাস আষ্টেক পরে, তার রক্ষাকর্তার অবিশ্রাম যত্নের ফলে, সেটা হয়ে দাঁড়াল এক সুন্দর স্পেনীয় জাতের কুকুর, লম্বা লম্বা তার কান, শিঙার মতো দেখতে ঝাঁকড়া ল্যাজ আর বড় বড় ভাব-ব্যাঞ্জক চোখ। কুকুরটা গেরাসিমের প্রচণ্ড ভক্ত হয়ে উঠল, এক মুহূর্তের জন্যে তার কাছ ছাড়ত না, ল্যাজ নাড়তে নাড়তে সর্বদা তার পেছনে পেছনে ঘুরত। গেরাসিম একটা নামও দিল তার — বোবা লোকেরা জানে তাদের গোঁ-গোঁ শব্দে অন্যদের দৃষ্টি টানা যায় তার অনুকারে নাম রাখল মুমু। অন্য চাকরবাকররাও সেটাকে ভালবাসত আর মুমুন্যা বলে ডাকত। অদ্ভুত বুদ্ধি ছিল তার, সকলেরই সোহাগ কুড়াত, কিন্তু ভালবাসত এক গেরাসিমকে। গেরাসিম নিজেও তার জন্যে পাগল ছিল... কুকুরটার গায়ে আর

কেউ হাত বুলালে তার ভালো লাগত না: ভগবানই জানেন আশঙ্কায় না ঈর্ষায়। রোজ সকালে মুমু তার কোট ধরে টেনে ঘুম ভাঙাত, জলের গাড়ি-টানা বুড়ো ঘোড়াটাকে, যার সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল, তার লাগাম মুখে ধরে নিয়ে যেত গেরাসিমের কাছে, মুখে একটা গম্ভীর ভাব ফুটিয়ে তার সঙ্গে যেত নদী পর্যন্ত, তার ঝাড়ুটা, বেলচাগুলো পাহারা দিত, আর কাউকে ঘেঁষতে দিত না তার ঘরের কাছে। শুধু তার সুবিধার জন্যে গেরাসিম দরজায় একটা ফুটো করে দিয়েছিল আর কুকুরটাও যেন বুঝে নিয়েছিল যে তার একচ্ছত্র রাজত্ব কেবল এই ঘরটাতেই। তাই ঘরে ঢুকেই খুশী হয়ে লাফিয়ে উঠত বিছানার ওপর। সারারাত্রি জেগে থাকত সে, কিন্তু অন্য বোকা কুকুরের মতো শুধু শুধু পেছনের পায়ে বসে মুখ তুলে চোখ কুঁচকে তারার দিকে তাকিয়ে একঘেয়েমির চাপে অনবরত তিনবার করে ঘেউ-ঘেউ করত না। না, অকারণে নয়। তার তীক্ষ্ম ডাক শোনা যেত তখনই যখন কোন অচেনা লোক বেড়ার খুব কাছ দিয়ে যেত অথবা কোন জায়গা থেকে সন্দেহজনক হট্টগোল বা খস্‌খস্‌ আওয়াজ কানে আসত... এক কথায়, অতি উৎকৃষ্ট পাহারাদার কুকুর ছিল সে। সত্যি বটে উঠোনে আর একটা বুড়ো কুকুর থাকত — তামাটে ছিটেওয়ালা হলদে রঙের, নাম ভল্‌চক্‌। কিন্তু রাত্রেও কখনও তার শেকল খোলা হত না; তাছাড়া সেটা এতই অথর্ব হয়ে গিয়েছিল যে ছাড়া পেতেও চাইত না, খালি নিজের ঘরটাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকত আর কখনও কখনও প্রায় নিঃশব্দে ধরা গলায় একটু ডাক ডেকে তখনি চুপ করে যেত, যেন টের পেত তার নিষ্ফলতা। কখনও জমিদার বাড়িটার ভেতরে ঢুকত না মুমু। যখন গেরাসিম কাঠ নিয়ে ঘরের মধ্যে যেত তখন সে সর্বদা বাইরে অলিন্দের ওপর অধীরভাবে অপেক্ষা করত — ভেতর থেকে সামান্য একটু শব্দ এলেই কান খাড়া করে মাথাটা ঘোরাত ডাইনে-বাঁয়ে।

একবছর এইভাবেই কেটে গেল। জমাদারের কাজ করে চলেছে গেরাসিম, নিজের ভাগ্যে সে বেশ খুশী, এমন সময় হঠাৎ একটা বিশেষ ঘটনা ঘটল... ব্যাপারটা হল এই: গ্রীষ্মের এক বেশ পরিষ্কার দিনে কর্ত্রী ঠাকরুণ তাঁর আশ্রিতা-বয়স্যা পরিবৃত হয়ে ড্রইং-রুমে পায়চারি করছিলেন। মেজাজ তাঁর শরীফ, বেশ হাসিঠাট্টা চালাচ্ছিলেন; আশ্রিতারাও তাঁর হাসিঠাট্টায় যোগ দিচ্ছিল, যদিও খুব একটা আনন্দ তাদের হচ্ছিল না। কর্ত্রীর এই রকম খোসমেজাজে তারা প্রমাদ গণত, কারণ প্রথমত তিনি সর্বদা চাইতেন যে আশেপাশের সবাই তড়িঘড়ি এবং পুরোদস্তুর তাঁর মেজাজে মেজাজ মেলাবে, কারো মুখ খুশীতে ডগমগ না দেখলেই তিনি রেগে যেতেন — দ্বিতীয়ত এই রকম দমকা খুশী সাধারণত টিকত খুব কম সময় আর তারপরেই তাঁর মেজাজ হত থমথমে আর তিরিক্ষে। সেদিনের আরম্ভটা তাঁর ভালই হয়েছিল, চারটে গোলাম উঠেছিল তাসে (রোজ সকালে তিনি তাস দেখে ভবিষ্যৎ গুণতেন), সকালের চা-টাও তাঁর বিশেষ ভাল লেগেছিল, সেই জন্যে ঝি মুখের প্রশংসা আর মুদ্রায় দশ কোপেক পেয়েছিল বখশিশ। তাই ড্রইং-রুমে পায়চারি করতে করতে, লোল ঠোঁটে মিষ্টি হাসি টেনে তিনি জানলার কাছে এলেন। জানলার নীচেই ছিল সাজান বাগান। আর ঠিক মাঝের কেয়ারিতেই একটা গোলাপ-ঝাড়ের তলায় শুয়ে মুমু প্রাণপণে একটা হাড় চিবোচ্ছিল। কর্ত্রী সেটাকে দেখে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে! ওটা আবার কোন কুকুর?'

যে বেচারী আশ্রিতাকে তিনি এই প্রশ্ন করলেন সে একেবারে থতমত হয়ে গেল, কর্ত্রীর কিস্ময়োক্তিকে ঠিক কীভাবে নিতে হবে সেটা ধরতে না পারলে অধীনস্থ লোকে যে একটা ক্লিষ্ট দর্ভাবনায় পড়ে, তেমনি।

কোনরকমে সে বলল, 'জা-জানি না রাণীমা — মনে হয় ওই বোবাটার।'

'আরে! দিব্যি সন্দর কুকুরটি!' কর্ত্রী থামিয়ে দিলেন তাকে, 'ওটাকে এখানে আনতে বলো। ওর কাছে কি এটা অনেকদিন আছে? আগে কখনও দেখি নি কি রকম?.. বলো, কুকুরটাকে নিয়ে আসতে।'

আশ্রিতাটি তৎক্ষণাৎ ছটে দেউড়ি ঘরে গিয়ে চেঁচাল, 'ওহে, এই, এখনি মমকে নিয়ে এসো এখানে! বাগানে আছে।'

'মম বলে ডাকে নাকি? খাসা নাম তো!' বললেন কর্ত্রী।

'হ্যাঁ ঠাকরণ, খাসা!' প্রতিধ্বনি করেই মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, 'জলদি করো, স্তেপান!'

ষণ্ডামার্ক জোয়ান স্তেপান খানসামা পড়িমড়ি ছটল বাগানে, মমকে ধরতে যাবে, কুকুরটা হঠাৎ সড়ৎ করে তার হাত ছাড়িয়ে ল্যাজ তুলে প্রাণপণ দৌড় লাগাল গেরাসিমের দিকে। সে তখন রান্নাঘরে একটা পিপে খালি করছিল এমনভাবে যেন একটা বাচ্চার ঢোলক উল্টে দিচ্ছে। পেছ পেছ ছটে এসে স্তেপান কুকুরটাকে ধরতে গেল তার প্রভুর পায়ের কাছেই, কিন্তু ক্ষিপ্র কুকুরটা পরের হাতে ধরা দিলে না, তিড়িং-তিড়িং করে লাফিয়ে তার হাত ফসকে যেতে লাগল। মচকি হেসে তার এই হয়রানিটা দেখছিল গেরাসিম। অবশেষে স্তেপান বিরক্তমখে উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি হাতমখ নেড়ে তাকে বোঝাল যে কর্ত্রীর ইচ্ছা কুকুরটা তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হোক। গেরাসিম একটু অবাক হল, কিন্তু মমকে ডেকে তাকে তুলে দিলে স্তেপানের হাতে। স্তেপান সেটাকে ড্রইং-রমে নিয়ে গিয়ে কাঠের কাজ-করা মেঝেতে নামিয়ে দিল। কর্ত্রী আদর করে তাকে কাছে ডাকতে লাগলেন। মম জীবনে কখনো এত জমকালো খাস-কামরায় আসে নি, ভয়ে সে দরজার দিকে ছটতে গেল, কিন্তু কর্তাভজা স্তেপানের তাড়া খেয়ে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

'মম, মম, আয় আমার কাছে, আয় তোদের রাণীমার কাছে,' ডাকলেন কর্ত্রী, 'আয় না বোকাটা!.. ভয় কি...'

আশ্রিতারাও তাড়া দিল, 'যা, মম, যা রাণীমার কাছে! যা, যা!'

মম কিন্তু খালি কাতরভাবে তাকাতে লাগল চারিদিকে, একটুও নড়ল না।

কর্ত্রী বললেন, 'ওকে কিছ খাবার এনে দাও তো। কি বোকা কুকুর! রাণীমার কাছে আসবে না! ভয়টা কিসের?'

ভীর ভীর বিগলিত গলায় এক আশ্রিতা বলল, 'এখনও তো আপনাকে চেনে নি!'

স্তেপান একটা পিরিচে দধ নিয়ে এসে মমর সামনে রাখল, কিন্তু মম সেটা শঁকল না পর্যন্ত, খালি আগের মতোই চারিদিকে তাকাতে তাকাতে কাঁপতে লাগল।

'ইস্, কী রে তুই!' বলে কর্ত্রী তার কাছে গিয়ে নীচু হয়ে যেই তার গায়ে হাত বলোতে

যাবেন, অমনি মুমু ঝটকা মেরে মাথা ঘুরিয়ে দাঁত বের করল। তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নিলেন কর্ত্রী...

মুহূর্তের স্তব্ধতা নামল। আস্তে কেঁউ-কেঁউ করতে লাগল মুমু যেন খেদ জানাচ্ছে, ক্ষমা চাইছে... বৃদ্ধা ভ্রূকুটি করে সরে গেলেন। কুকুরটার আচমকা ভঙ্গিতে তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

আশ্রিতার দল সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই মাগো! কামড়ায় নি তো আপনাকে? ভগবান রক্ষা করুন! কি সর্বনাশ!' (জীবনে মুমু কখনও কাউকে কামড়ায় নি)।

'দূর করো ওটাকে!' বৃদ্ধার গলার স্বর একেবারে বদলে গেছে, 'হতচ্ছাড়া কুত্তা, কী বদমেজাজী!'

এই বলে ধীরে ধীরে পেছন ফিরে তিনি পড়ার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। আশ্রিতাদল পরস্পর ভীরু দৃষ্টি-বিনিময় করে তাঁর পেছন পেছন যেতে গিয়েছিল। তিনি থেমে গিয়ে কঠোর দৃষ্টি হেনে, 'এ আবার কেন? আমি তো তোমাদের ডাকি নি!' এই বলে চলে গেলেন।

আশ্রিতাদল মরীয়ার মতো হাত নাড়তে লাগল স্তেপানের দিকে; সেও মুমুকে তুলে নিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিল সোজা গেরাসিমের পায়ের গোড়ায়। আধঘণ্টার মধ্যেই একেবারে থমথমে হয়ে গেল বাড়ি। আর বৃদ্ধা মহিলা ঝড়ের মেঘের চেয়েও মুখ অন্ধকার করে সোফার ওপর বসে রইলেন।

দ্যাখো কাণ্ড, কত সামান্য জিনিসেও কখনও কখনও লোকের মেজাজ বিগড়ে যায়!

বাকি দিনটা কর্ত্রী থমথমে হয়ে রইলেন, কারো সঙ্গে কথা বললেন না, তাস খেললেন না, ভাল করে ঘুমোলেন না। তাঁর মাথায় ঢুকল তিনি ঠিক যে ওডিকলোন ব্যবহার করেন সেটা দেওয়া হয় নি, তাঁর বালিশে সাবানের গন্ধ ছাড়ছে, শয্যা-তত্ত্বাবধায়িকাকে দিয়ে বিছানার চাদর-টাদর সব শোঁকালেন পর্যন্ত — এক কথায় খুব অস্থির 'আগুন' হয়ে রইলেন। পরের দিন সকালে তিনি অন্য দিনের চেয়ে এক ঘণ্টা আগেই গাভ্রিলাকে তলব করলেন।

বাজার-সরকার ভেতরে ভেতরে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর পড়ার ঘরের চৌকাট মাড়াতেই তিনি আরম্ভ করলেন, 'বলো তো বাপু, এ কোন কুকুর কাল সারারাত উঠোনে ডেকেছে? আমায় ঘুমতে দেয় নি!'

'আজ্ঞে, কুকুর?.. কোন কুকুর?... আজ্ঞে, বোবার কুকুরটা নাকি?' কম্পিত কণ্ঠে বলল সে।

'জানি না বোবার কি আর কারো। তবে আমাকে ঘুমোতে দেয় নি। এও বাপু আশ্চর্য, আমাদের এত গাদা গাদা কুকুর নিয়ে হবে কি শুনি! জানতে চাই আমি! আমাদের একটা পাহারাদার কুকুর তো আছে, না নেই?'

'আজ্ঞে, তা আছে বৈকি, আজ্ঞে, ওই ভল্‌চক্।'

'বেশ, তাহলে আবার কেন, আরো কি দরকার? খালি গোলমাল হয়। আসলে বাড়িতে তোমাদের মাথার ওপর মুরুব্বী কেউ নেই — এই হল ব্যাপার। বলি, বোবাটার আবার কুকুরের কি দরকার? আমার বাড়িতে তাকে কুকুর রাখতে অনুমতি দিল কে? কাল জানলা দিয়ে দেখি

ওটা বাগানে শুয়ে শুয়ে কি একটা বীভৎস জিনিস এনে চিবোচ্ছে — অথচ ওটা আমার গোলাপ গাছের জায়গা...'

এক মুহূর্ত থেমে আবার বললেন, 'আজই ওটা যেন বিদায় হয় — বুঝেছ?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'আজই! এখন যাও! পরে তোমার রোজকার খতিয়ান শুনব।'

গাব্রিলা চলে গেল।

ড্রইং-রুম দিয়ে যাবার সময় বাজার-সরকার হাত-ঘণ্টিটা এক টেবিল থেকে তুলে অন্য টেবিলে রাখল একটু 'ছিমছাম দেখাবার' জন্যে, আস্তে তার পাতিহাঁসের ঠোঁটের মতো নাকটি ঝেড়ে দেউড়ি ঘরে ঢুকল। সিন্দুকের মতো দেখতে একটা বেঞ্চিতে স্তেপান পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল ঠিক যেন লড়াইয়ের ছবিতে আঁকা মৃত যোদ্ধার মতো; কম্বলের বদলে গায়ে চাপা দেওয়া কোটটার নীচে থেকে তার নাঙ্গা পাদুটো ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। বাজার-সরকার তাকে ঝাঁকানি দিয়ে তুলে মৃদুস্বরে কি যেন হুকুম করল; জবাবে স্তেপানের মুখে ফুটল আধো হাই, আধো হাসি। বাজার-সরকার চলে গেল আর স্তেপান লাফিয়ে উঠে কামিজ আর বুট চড়িয়ে গিয়ে দাঁড়াল অলিন্দে। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই গেরাসিম হাজির হল পিঠে বিরাট কাঠের বোঝা নিয়ে আর তার পায়ে পায়ে এল নিত্যসঙ্গী মুমু। (বৃদ্ধা মহিলা গ্রীষ্ম কালেও তাঁর শোবার ঘর আর পড়ার ঘর গরম রাখার হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন)। দরজার সামনে আড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধ দিয়ে ঠেলে বোঝাসমেত ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকল গেরাসিম, আর বরাবরের মতো বাইরে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল মুমু। এই সুযোগে স্তেপান ছোঁ মেরে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠিক যেমন মুরগিছানার ওপর চিল ছোঁ মারে, তারপর সেটাকে চেপে ধরে দুই হাতে আঁকড়ে টুপিটা পর্যন্ত মাথায় না দিয়ে দৌড়ে গেল বাইরে এবং প্রথমে যে গাড়িটা পেল তাইতে চড়ে ছুটল 'ওখোৎনি রিয়াদ' বাজারে। শিগ্‌গিরই এক খদ্দের জুটিয়ে আধ রুবলে তাকে কুকুরটা বিক্রী করে দিল, কেবল এই সর্তে যে অন্তত এক সপ্তাহ সে যেন সেটাকে বেঁধে রাখে। তারপর সে ফিরে গেল। বাড়ি পৌঁছবার আগেই কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে, পেছনের গলি দিয়ে এসে উঠোনে ঢুকল বেড়া টপকে; গেরাসিমের সঙ্গে দেখা হবার ভয়ে ফটক দিয়ে ঢুকতে সাহস করল না।

তবে তার ভয়ের কারণ ছিল না: গেরাসিম ছিল না উঠোনে। বাড়ি থেকে বেরোবামাত্রই সে মুমুর অন্তর্ধান টের পায়; এর আগে কখনও এমন ঘটে নি যে মুমু তার জন্যে অপেক্ষা করছে না। সর্বত্র ছুটোছুটি করে সে তাকে খুঁজে বেড়ায় আর তার নিজস্ব ভঙ্গিতে ডাকতে থাকে... নিজের ঘরে দেখল, খড়ের গাদায় উঁকি মারল, ছুটে বেরোল রাস্তায়, সব জায়গা তন্নতন্ন করল... পাত্তা নেই! মরীয়া অঙ্গভঙ্গি করে সে সবাইকে জিজ্ঞেস করল তার কথা, নীচু হয়ে হাতটা মাটি থেকে বিঘতখানেক উঁচুতে ধরল, হাত দিয়ে মুমুর চেহারাটা বোঝাবার চেষ্টা করল... কেউ কেউ সত্যিই জানত না মুমু কোথায়, তাই কেবল মাথা নাড়ল, অন্যেরা জানলেও জবাবে খালি হাসতে লাগল, আর বাজার-সরকার ভারিক্কি চালে সহিসদের বকতে আরম্ভ করল। গেরাসিম তখন উঠোন থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

যখন সে ফিরল তখন সন্ধ্যা হব-হব। তার অবসন্ন চেহারা, আলুথালু পদক্ষেপ আর ধুলোমাখা জামাকাপড় থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে সে অর্ধেক মস্কোর রাস্তা চষে বেড়িয়েছে। কর্ত্রীর জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, অলিন্দে যেখানে ছ'-সাতজন চাকর জটলা করছিল সেইদিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আর একবার গঙিয়ে উঠল 'মুমু'... মুমু সাড়া দিল না। চলে গেল সে। সবাই তার দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু কেউ হাসল না, একটি কথাও বলল না... পরদিন সকালে সদা-কৌতূহলী সহিস আন্তিপ্কা রান্নাঘরে সবাইকে জানাল যে সারারাত বোবাটা কাতরেছে।

পরের গোটা দিনটা গেরাসিম ঘর ছেড়ে বেরোল না। ফলে পোতাপ্ সহিসকে জল আনতে হল, এতে বেজায় অসন্তুষ্ট হল সে। কর্ত্রী গাভ্রিলাকে তাঁর হুকুম তামিল হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করাতে গাভ্রিলা বলল হয়েছে। পরের দিন গেরাসিম কোটর থেকে বেরিয়ে কাজে লাগল। দুপুরে খাবার সময় সে টেবিলে এল, খেল, কিন্তু কাউকে নমস্কার না করেই চলে গেল। বোবাকালাদের মুখ সাধারণত এমনিতেই ভাবলেশহীন, সে মুখ তার এখন হয়ে উঠল একেবারে পাথরের মতো। খেয়েদেয়ে সে আবার বেরিয়ে যায়, কিন্তু শিগ্গির ফিরেই সে চলে যায় খড়ের গাদায়। রাত্তির হল ফুটফুটে চাঁদিনী রাত। খড়ের ওপর পড়ে থেকে অবিরাম এপাশ ওপাশ করছে গেরাসিম আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে এমন সময় হঠাৎ সে টের পেল কে যেন তার কোটটা ধরে টানছে: তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল, কিন্তু মাথা তুললে না সে, এমন কি চোখদুটোও বন্ধ করে রইল। কিন্তু ফের আবার হ্যাঁচ্কা টান, আগের চেয়েও জোরে: তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল সে... সামনে তার মুমু, লাফাচ্ছে, গলা থেকে ঝুলছে এক গাছি ছেঁড়া দড়ি। গেরাসিমের বোবা বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘ আনন্দের গোঙানি; মুমুকে সে জোরে বুকে চেপে ধরল, এক মুহূর্তেই মুমু চেটে নিল তার নাক, চোখ, গোঁফ, দাড়ি... কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবল গেরাসিম, চুপিচুপি খড়ের গাদা থেকে নামল; কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না দেখে নিয়ে নিরাপদে নিজের কুঠরীতে চলে এল।

সে আগেই আন্দাজ করেছিল কুকুরটা নিশ্চয় হারিয়ে যায় নি, নিশ্চয় কর্ত্রীর হুকুম অনুসারে তাকে সরান হয়েছিল; চাকরবাকররা হাতমুখ নেড়ে তাকে বুঝিয়েছিল কীভাবে কর্ত্রী ঠাকরুণের দিকে খেঁকিয়ে উঠেছিল তার মুমু, সুতরাং সে স্থির করল সাবধান হতে হবে। প্রথমে সে তাকে রুটি খেতে দিয়ে, আদর করে, ঘুম পাড়িয়ে তারপর ভাবতে বসল। সারারাত ভাবল সবচেয়ে ভাল কি উপায়ে মুমুকে লুকিয়ে রাখা যায়। অবশেষে সে স্থির করল তাকে দিনের বেলায় ঘরে বন্ধ রাখবে, কেবল মাঝে মাঝে দেখে যাবে, আর রাত্তিরে নিয়ে বেরোবে। নিজের পুরোনো চাপকানটা দিয়ে ভালো করে দরজার ফুটোটা বন্ধ করে দিল সে, আর সকাল হতে না হতেই উঠোনে বেরিয়ে পড়ল যেন কিছুই ঘটে নি, এমনকি মুখের তখনও সেই বিষণ্ণ ভাবটাও বজায় রাখল (নিরীহ ধূর্ততা!)।

বেচারা কালার মাথায় একবারও এল না যে মুমুর কুঁই-কুঁই শব্দে তার উপস্থিতির কথা সবাই টের পেয়ে যাবে; সত্যিই সব চাকর-চাকরানিরা খুব শিগ্গির টের পেয়ে গেল যে বোবার কুকুর

ফিরে এসেছে আর তার ঘরে তালাবন্ধ করা আছে। কিন্তু খানিকটা কুকুর আর তার মালিকের ওপর অনুকম্পার জন্যে আর খানিকটা গেরাসিমের ভয়ে কেউ ওর সামনে প্রকাশ করল না যে তার গোপন খবর ওদের জানা। কেবল বাজার-সরকার মাথার পেছনটা চুলকে এমন একটা ভঙ্গি করল যার মানে হয়: 'যাকগে, মরুকগে — কর্ত্রী না জানতে পারলেই হল!' অন্যদিকে সেদিনের মতো কাজে উৎসাহ বোবার আর কখনও দেখা যায় নি: সমস্ত উঠোনটা ঘষে মেঝে তক্‌তকে করল, ঘাস ওপড়াল, বাগানের চারদিকের বেড়াটার প্রত্যেকটা খুঁটি শক্ত আছে কিনা দেখবার জন্যে একবার নিজের হাতে উপড়ে আবার ঠিক জায়গায় ঠুকে পুঁতল — এক কথায়, হৈচৈ করে এমন কাণ্ড করতে লাগল যে কর্ত্রীর পর্যন্ত চোখে পড়ল তার উৎসাহ।

দিনের মধ্যে একবার কি দুবার সে চুপিচুপি তার বন্দী প্রাণীটিকে দেখে যায়: সন্ধেবেলায় তার পাশেই সে শুয়ে পড়ল, খড়ের গাদায় নয়, নিজের ঘরে, আর কেবল রাত একটার পরই একটু হাওয়া খাওয়াবার জন্যে বেরোল তাকে নিয়ে। আঙিনায় অনেক বেড়িয়ে যখন তারা ফিরছে তখন বেড়ার কাছের গলিটা থেকে একটা খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা গেল। মুমু কান খাড়া করে গর্জে উঠে দৌড়ল বেড়ার ধারে, তারপর একটু শুঁকে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল তীক্ষ্ম উচ্চস্বরে। কোন ব্যাটা মাতাল সেখানে রাত কাটাবার মতলব করছিল। এবং ঠিক সেই সময়টিতেই অনেকক্ষণ 'স্নায়বিক অশান্তিতে' ভুগে কর্ত্রী ঠাকরুণের সবে ঘুম এসেছিল — তাঁর বরাবর ঐ রকম অশান্তি হত রাত্রে একটু বেশি রকম গুরুভোজন করলেই। হঠাৎ কুকুরের চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল; হৃৎপিণ্ডটা তাঁর ধড়ফড় করে উঠে যেন থেমে গেল। আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি, 'ওলো, মেয়েরা, মেয়েরা, ওরে মেয়েরা!' ভয় পেয়ে দাসীরা সব তাঁর শোবার ঘরে ঢুকল। হুড়মুড় করে হতাশভাবে তিনি হাত আঁকুপাঁকু করে বলতে লাগলেন, 'ওরে, ওরে, আমি ম'লাম! আবার সেই কুকুরটা!.. ডাক্তারকে ডেকে পাঠাও, এখনই! আমাকে মেরে ফেলতে চায়... সেই কুকুরটা, আবার সেই কুকুরটা!.. মাগো!' এই সব বলেই মাথাটা পেছনদিকে উল্টিয়ে দিলেন, যেটাকে মূর্ছা যাওয়ার লক্ষণ বলে সবার ধরার কথা।

ছুটল সবাই ডাক্তার, মানে বাড়ির বৈদ্য খারিতন্‌কে ডাকতে। এর একমাত্র গুণ ছিল, সে নরম সোলের বুট পরত আর খুব আলতোভাবে তার রুগীর নাড়ী টিপত। তারপর দিনে চোদ্দ ঘণ্টা ঘুমিয়ে আর বাকি সময়টা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর কর্ত্রীকে অনবরত লরেলের আরক খাইয়ে কাটত। ছুটতে ছুটতে তৎক্ষণাৎ বৈদ্য এল, একগোছা পালক পুড়িয়ে ধোঁয়া দিলে আর ঠাকরুণ চোখ মেলতেই রুপোর রেকাবিতে ছোট একটা গেলাসে সেই ধন্বন্তরি লরেলের আরক ধরল তাঁর সামনে। কর্ত্রী ওষুধ গিলেই কাঁদুনি গাইতে লাগলেন কুকুরটা, গাভ্রিলা, তাঁর ভাগ্য নিয়ে, বুড়োবয়সে সবাই তাঁকে ছেড়েছে, কারো তাঁর জন্যে একটু মায়ামমতা নেই, ওরা সবাই তার মরণ চায়। বেচারা মুমু ওদিকে ডেকেই চলেছে, গেরাসিম বৃথাই চেষ্টা করে চলেছে তাকে বেড়ার ধার থেকে টেনে আনবার। 'ঐ, ঐ, আবার, আবার...' কঁকিয়ে উঠে কর্ত্রী আবার চোখ ওল্টালেন। ডাক্তার একজন মেয়েকে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বলল; মেয়েটি দেউড়ি ঘরে ছুটে গেল স্তেপানকে জাগাবার

জন্যে, স্তেপান ছুটল গাভ্রিলাকে জাগাতে, আর গাভ্রিলাও উত্তেজিত হয়ে হুকুম করল বাড়িশুদ্ধ সকলেরই ঘুম ভাঙিয়ে দিতে।

গেরাসিম ফিরে তাকাতেই দেখল জানলাগুলোতে আলো আর ছায়ার ছুটোছুটি, বিপদ ঘনিয়ে আসছে টের পেয়ে সে মুমুকে বগলদাবা করে একছুটে নিজের কুঠরীতে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। খানিক পরেই পাঁচজনে মিলে গায়ের জোরে দরজা খোলার চেষ্টা করে যখন দেখল যে নেহাৎ দরজা বন্ধ তখন নিবৃত্ত হল। গাভ্রিলা পাগলের মতো দৌড়ে এসে হুকুম করল সবাইকে সকাল পর্যন্ত সেইখানে দাঁড়িয়ে দরজা পাহারা দিতে হবে। তারপর চাকরানিদের ঘরে ছুটে এসে প্রধানা আশ্রিতা ল্যুবোভ্ ল্যুবিমভ্‌নাকে দিয়ে কর্ত্রীর কাছে খবর পাঠাল যে কুকুরটা, দুঃখের বিষয়, কোথা থেকে ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু পরদিনই সেটাকে মেরে ফেলা হবে, আর কর্ত্রী ঠাকরুণ যেন দয়া করে রাগ থামান, শান্ত হন। (এই ল্যুবোভ্ ল্যুবিমভ্‌নার সঙ্গে একত্রেই সে চা, চিনি ও ভাঁড়ারের অন্যান্য জিনিসপত্রের হিসাব রাখত এবং চুরি করত)। কর্ত্রী এত শিগ্‌গির হয়ত শান্ত হতেন না যদি ডাক্তার তাড়াহুড়োতে বারো ফোঁটার জায়গায় পুরো চল্লিশ ফোঁটা আরক না ঢেলে বসত: ওষুধে ফল হল, পনেরো মিনিটের মধ্যে ঠাকরুণ গভীর শান্ত ঘুমে ঢলে পড়লেন। আর গেরাসিম মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে মুমুর মুখ কষে চেপে ধরে পড়ে রইল বিছানায়।

পরদিন সকালে অনেক বেলায় কর্ত্রী চোখ মেললেন। গেরাসিমের দুর্গে মোক্ষম হানা দেবার আগে গাভ্রিলা অপেক্ষা করছিল কর্ত্রীর ঘুম ভাঙার, আর নিজেও প্রস্তুত হচ্ছিল একটা বজ্রপাত সইতে। বজ্রপাত কিন্তু ঘটল না। বিছানায় শুয়েই ঠাকরুণ প্রধানা আশ্রিতাকে ডেকে পাঠালেন।

'ল্যুবোভ্ ল্যুবিমভ্‌না,' বললেন অতি মৃদু ক্ষীণস্বরে, মাঝে মাঝে তাঁর বেশ লাগত নিরুপায় নির্যাতিত শহীদের ভান করতে, এবং বলাই বাহুল্য, বাড়ির সবাই এই রকম সময়ে বড়ই অস্বস্তি বোধ করত। 'ল্যুবোভ্ ল্যুবিমভ্‌না, দেখছ তো আমার অবস্থা; যাও লক্ষ্মীটি, গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচের কাছে গিয়ে কথা বলো: এও কি সম্ভব যে একটা হতচ্ছাড়া কুকুর তার কর্ত্রীর মনের শান্তির চেয়ে, এমনকি প্রাণের চেয়েও বেশি? এ যে আমার বিশ্বাসই হয় না,' আবেগের সঙ্গে বললেন তিনি, 'যাও না লক্ষ্মীটি, যাও একবার গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচের কাছে।'

ল্যুবোভ্ ল্যুবিমভ্‌না গেল গাভ্রিলার ঘরে। তারা যে কি বলাবলি করল জানা নেই, কিন্তু খুব অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল পুরো একদল লোক উঠোন পেরিয়ে গেরাসিমের কুঠরীর দিকে যাচ্ছে: দলের সামনে গাভ্রিলা, হাত দিয়ে টুপি মাথায় চেপে ধরা, যদিও হাওয়া মোটে ছিল না; তার পেছনে চাপরাশী, বাবুর্চীরা; জানলা দিয়ে দেখছে 'লেজা' খুড়ো আর হুকুম চালাচ্ছে, মানে, খালি হাত নাড়াচ্ছে এদিক ওদিক, আর সবার পেছনে চলেছে একপাল ছোঁড়া অঙ্গভঙ্গি করে লাফাতে লাফাতে, তাদের অর্ধেকেই মোটেই ও বাড়ির নয়। গেরাসিমের ঘরে যাবার সরু সিঁড়িটার ওপর একজন পাহারাদার বসে, আর দুজন লাঠি নিয়ে আছে দরজার সামনে। এদের দলটা এসে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সমস্ত সিঁড়িটা জুড়ে দাঁড়াল। গাভ্রিলা দরজায় গিয়ে ঘুষি মেরে ঘা দিয়ে চেঁচাল:

'দরজা খোল!'

একটা চাপা ঘেউ-ঘেউ শোনা গেল, আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

'দরজা খোল বলছি!'

নিচে থেকে স্তেপান বলল, 'আরে, গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচ, ও যে কানে কালা — আপনার কথা শুনতেই পাচ্ছে না।'

সবাই হেসে উঠল।

'তাহলে করা যায় কি?' ওপরের সিঁড়ি থেকে বলল গাভ্রিলা।

স্তেপান বলল, 'ঐখানটায় দরজায় একটা ফুটো আছে। একটা লাঠি ঢুকিয়ে খোঁচাতে থাকুন।'

নীচু হয়ে দেখল গাভ্রিলা।

'ওতে একটা চাপকান না কি গুঁজে রেখেছে।'

'আরে ওটা ভেতরে ঠেলে দিন-না — ব্যস্।'

আবার একটা চাপা ঘেউ-ঘেউ শোনা গেল।

'ঐ, দ্যাখ, নিজেই জানানি দিচ্ছে,' জটলার মধ্যে থেকে কে একজন বলল আর সবাই আবার হেসে উঠল।

গাভ্রিলা তার কানের পেছনটা চুলকে অবশেষে বলল:

'না ভায়া, ইচ্ছা হয় তুমিই চাপকানটা ঠেলে ফেলগে।'

'ঠিক আছে!' বলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে লাঠিটা নিয়ে স্তেপান চাপকানটা ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে লাঠিটা ফুটোর মধ্যে খোঁচাতে খোঁচাতে বলতে লাগল:

'বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় বলছি!'

লাঠিটা সে নাড়িয়েই চলেছে এমন সময় হঠাৎ দরজাটা দড়াম্ করে খুলে যেতেই ওরা সব পড়িমরি সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়ল। গাভ্রিলা সবার আগে। 'লেজা' খুড়োও খটাস্ করে জানলা বন্ধ করে দিল।

উঠোন থেকে গাভ্রিলা চেঁচাল, 'এই-এই-এই-এই! খবরদার বলছি, খবরদার!'

গেরাসিম নিশ্চল হয়ে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। লোকগুলো সিঁড়ির নীচে জটলা পাকিয়ে। অবহেলাভরে কোমরে হাত দিয়ে জার্মান ছাঁটের শার্টপরা এই লোকগুলোর দিকে গেরাসিম তাকাল ওপর থেকে, তাদের সামনে ওর লালরঙ চাষীর কামিজে ওকে দেখাল যেন একটা দৈত্য।

এক পা এগিয়ে এল গাভ্রিলা, বললে:

'খবরদার, ভায়া, কোনরকম দৌরাত্ম্য চলবে না বলে দিচ্ছি!'

এই বলে হাতমুখ নেড়ে তাকে বোঝাতে চাইল যে কর্ত্রী সেই মুহূর্তে তার কুকুরটা তলব করেছেন, দিয়ে দাও বাপু নইলে বিপদে পড়বে।

গেরাসিম তাকাল তার দিকে, তারপর কুকুরটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নিজের গলায় ফাঁসটানার মতো ভঙ্গি করে জিজ্ঞাসু চোখে চাইল বাজার-সরকারের দিকে।

মাথা নেড়ে সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেবারে তাই।'

চোখ নামিয়ে নিলে গেরাসিম, তারপর হঠাৎ নিজেকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে মুমুর দিকে ইঙ্গিত করল — সেটা সমস্তক্ষণ তার পাশে দাঁড়িয়ে নিরীহের মতো ল্যাজ নাড়াচ্ছিল আর কৌতূহলে কান খাড়া করে ছিল। গেরাসিম আবার নিজের গলা টেপার ভঙ্গি করে আপন বুকে দমাদ্দম কীল মারল, যেন ঘোষণা করল যে সে নিজেই মুমুকে মেরে ফেলার ভার নিচ্ছে।

'আরে ধেৎ, তুমি ঠকাবে,' জবাবে হাত ঝটকা দিল গাভ্রিলা।

গেরাসিম তার দিকে দৃষ্টি হেনে অবজ্ঞার হাসি হেসে আর একবার বুক চাপড়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

নিঃশব্দে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

গাভ্রিলা শুরু করল, 'ওর মতলবটা কি? আবার দরজায় খিল লাগাল নাকি?'

স্তেপান বলল, 'ছেড়ে দিন, গাভ্রিলা আন্দ্রেয়িচ। ওর যে কথা সেই কাজ। ও মানুষই ঐ রকম... কথা যখন দিয়েছে, করবে। আমাদের মতো নয় হে। সত্যি যা তা সত্যি।'

অন্যেরাও মাথা নেড়ে প্রতিধ্বনি করল, 'সত্যি, তাই বটে।'

'লেজা' খুড়োও জানলা খুলে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'তা বেশ, দেখা যাক,' বলল গাভ্রিলা, 'কিন্তু পাহারা ওঠাব না। আরে এই, ইয়েরোস্কা!' চেঁচিয়ে ডাকল সে এক প্যাঙাশে চেহারার লোককে, পরণে ছিল হলদে রঙের খাদি আলখাল্লা — ধরা হত তাকে বাগানের মালী। 'তোর এখন কাজ কী? একটা লাঠি নিয়ে এইখানে বসে থাক আর কিছু ঘটলেই তখনি আমাকে ছুটে খবর দিস!'

৪

বসল ইয়েরোস্কা এক লাঠি নিয়ে নীচের সিঁড়িতে। লোকগুলো ছত্রভঙ্গ হল, রইল কেবল গোটাকয়েক নিষ্কর্মা আর ছেলে-ছোকরা। গাভ্রিলা বাড়ি ফিরে ল্যুবোভ্ ল্যুবিমভ্‌নাকে দিয়ে কর্ত্রীকে খবর পাঠাল যে তাঁর হুকুম তামিল হয়েছে। তবে সাবধানতার জন্যে সে সহিসকে পাঠাল থানার পেয়াদার কাছে। কর্ত্রী ঠাকরুণ রুমালটা দলা পাকিয়ে তাতে খানিক ওডিকলোন ঢেলে সেটা শুঁকলেন, তা দিয়ে রগ ঘষলেন, একটু চা খেলেন এবং এখনও লরেল আরকের ঝোঁক কাটে নি বলে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

এই সব হৈচৈ মিটবার ঘণ্টাখানেক পরে গেরাসিম দরজা খুলে বেরোল। গায়ে তার পোশাকী কামিজটা আর হাতে ধরা মুমুর দড়ি। ইয়েরোস্কা পথ ছেড়ে দিল তাকে। গেরাসিম ফটকের দিকে গেল। ছেলেগুলো আর যারা সবাই উঠোনে ছিল চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু সে ফিরেও তাকাল না, টুপিটা মাথায় দিল কেবল রাস্তায় নেমে। গাভ্রিলা ইয়েরোস্কাকে তার পেছনে পাঠাল নজর রাখতে। দূর থেকে ইয়েরোস্কা তাকে একটা সরাইখানায় ঢুকতে দেখে তার বেরোনর অপেক্ষা করতে লাগল।

সরাইখানায় গেরাসিমকে সবাই চিনত আর তার ইসারা বুঝত। সে মাংস দেওয়া বাঁধাকপির

সুরুয়া ফরমাস করে টেবিলে হাত ভর দিয়ে বসল। বুদ্ধিমান চোখে মুমু তার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। খুবই চেকনাই দিচ্ছিল তার লোমগুলো: বোঝা যায় তা সবে আঁচড়ান হয়েছে। সুরুয়া রাখা হল গেরাসিমের সামনে। সে তাতে কিছু রুটি গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়ে, মাংসগুলো কুচি কুচি করে প্লেটটা নামিয়ে দিল মাটিতে। মুমু তার অভ্যস্ত মার্জিত ঢঙে খাবারে মুখ প্রায় না ঠেকিয়ে খেতে লাগল। বহুক্ষণ তাকে চেয়ে দেখল গেরাসিম; হঠাৎ তার গাল বেয়ে বড় বড় দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল: একফোঁটা পড়ল ছোট কুকুরটির খাড়া কপালে আর একফোঁটা সুরুয়ার মধ্যে। হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে। মুমু অর্ধেকটা খেয়ে সরে গিয়ে মুখ চাটতে লাগল। গেরাসিম উঠে সুরুয়ার দাম চুকিয়ে বেরিয়ে গেল; পেছন থেকে খানিকটা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল যে লোকটা খাবার পরিবেশন করে। গেরাসিমকে দেখতে পেয়েই ইয়েরোস্কা কোণের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, তারপর ও পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতেই ফের পিছু নিল।

মুমুর গলার দড়ি ধরে মন্থর গতিতে হাঁটছিল গেরাসিম। রাস্তাটার মোড়ে পেঁছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে লাগল সে, তারপর হঠাৎ দ্রুত পায়ে চলতে লাগল সোজা ক্রিম্‌স্কি খেয়ার দিকে। যেতে যেতে যেখানে একটা বাড়ির একটা দিক নতুন তৈরি হচ্ছিল সেটার ভেতর ঢুকে আবার বেরিয়ে এল বগলে দুটো ইঁট নিয়ে। ক্রিম্‌স্কি খেয়ার থেকে মোড় নিয়ে সে নদীর কিনার ধরে যেখানে গিয়ে পেঁছল সেখানে দাঁড়সমেত দুটো নৌকো বাঁধা ছিল খোঁটায় — সে আগেই সেগুলো লক্ষ্য করে রেখেছিল — তার একটাতে সে লাফিয়ে উঠল মুমুকে নিয়ে। সব্জি-ক্ষেতের কোণে একটা চালার ভেতর থেকে এক খোঁড়া বুড়ো বেরিয়ে এসে তার উদ্দেশে চেঁচামেচি শুরু করল। কিন্তু গেরাসিম শুধু মাথাটা নেড়ে এমন জোরে দাঁড় টানতে লাগল যে দেখতে দেখতে, স্রোতের বিপক্ষে হলেও, নদীর উজানে চলে গেল শ'চারেক হাত দূরে। বুড়ো বেচারী দাঁড়িয়ে থেকে থেকে, প্রথমে বাঁ হাত তারপরে ডান হাত দিয়ে পিঠটা চুলকে আবার ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ফিরে গেল চালাটাতে।

নৌকো বেয়েই চলল গেরাসিম। এতক্ষণে সে শহর ছাড়িয়ে গেছে। মাঠ, সব্জি-ভুঁই, ক্ষেত, গাছের ঝোপ, কুঁড়েঘর সব দেখা যেতে লাগল নদীর দুই তীরে। ফুটে উঠল গ্রামের আমেজ। তখন সে দাঁড় ছেড়ে দিয়ে, সামনের শুকনো জায়গাটায় বসা মুমুর মাথায় মুখ নামিয়ে — নৌকোটার খোলে জল ছিল — তার পিঠের ওপর মস্ত দুই হাত আড়াআড়ি রেখে নিশ্চল হয়ে বসে রইল আর স্রোতে নৌকোটা ধীরে ধীরে ভেসে চলল শহরের দিকে। অবশেষে পিঠটান করে বসল গেরাসিম, মুখে তার কেমন একটা রুগ্ন নিষ্ঠুরতা, তাড়াতাড়ি সে দড়িতে ইঁটদুটো বেঁধে তাতে একটা ফাঁস করে মুমুর গলায় পরিয়ে তাকে শূন্যে তুলে শেষবার তার দিকে তাকাল... সেও তার দিকে তাকিয়ে রইল বিশ্বাসের সঙ্গে, নির্ভয়ে, আর একটু একটু ল্যাজ নাড়তে লাগল। মুখটা ফিরিয়ে নিলে গেরাসিম, চোখদুটো সজোরে বন্ধ করে সে হাতের মুঠো আলগা করে দিল... গেরাসিম কিছুই শুনতে পেল না, না পড়ন্ত মুমুর দ্রুত কেঁউ-কেঁউ ডাক, না জলে পড়ার ভারী ঝপাং শব্দ। সবচেয়ে কোলাহলময় দিনও তার কাছে নির্বাক, নিস্তব্ধ, সবচেয়ে নিঝুম রাতও যা আমাদের কাছে নয়। যখন সে চোখ খুলল তখন আগের মতোই ছোট ছোট

ঢেউগুলো জলের ওপর যেন একটা আর একটাকে তাড়া করে ছুটেছে, আগের মতোই নৌকোর গায়ে ছলাৎ করে উঠছে জল, কেবল তার পেছনে, অনেক দূরে, তীরের দিকে ছুটে আসছে ছড়িয়ে যাওয়া বৃত্তাকার কী সব পাক।

গেরাসিম চোখের আড়াল হতেই ইয়েরোস্কা বাড়ি ফিরে যা দেখেছে সব জানাল।

'হুঁ, ঠিকই,' স্তেপান বলল, 'ওকে জলেই ডোবাবে। এখন নিশ্চিন্তি। সে যখন কথা দিয়েছে...'

সেদিন গেরাসিমকে কেউ দেখতে পেল না। দুপুরে খাবার সময় এল না সে। সন্ধ্যা নামল, সবাই খেতে জুটল, কেবল ওই নেই।

'আচ্ছা, ক্ষ্যাপা তো এই গেরাসিমটা!' মোটা ধোপানী বলল মিহি গলায়, 'একটা কুকুরের জন্যে এত উদাস!.. সত্যি বাপু!'

স্তেপান বলে উঠল চামচে দিয়ে লপ্সি তুলতে তুলতে, 'আরে, গেরাসিম যে এখানে এসেছিল!'

'সে কি? কখন?'

'এই তো, ঘণ্টা দুয়েক আগে। আসে নি মানে? ফটকে দেখেছি তাকে, আবার রাস্তায় বেরিয়ে গেল। কুকুরটার কথা জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। তবে দেখলাম, মন ওর খারাপ। আমাকে এক ধাক্কা দিল; মনে হয় আমাকে খালি তার সামনে থেকে সরিয়ে দিতেই চেয়েছিল, মানে বলতে চাইছিল আমায় রেহাই দাও তো বাপু, আর এমন আখাম্বা বিরাশী সিক্কা ছাড়লে আমার পিঠে ওরে বাপ্‌রে,' ক্লিষ্ট হেসে কুঁকড়ে গেল স্তেপান, মাথার পেছনটাতে হাত বুলোতে লাগল। 'হ্যাঁ, হাত বটে, পেল্লায় হাত! মাইরি!'

স্তেপানের দুর্দশায় সবাই হেসে উঠল, আর খাওয়ার পর যে যার চলে গেল শুতে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একজন প্রকাণ্ড লোক পিঠে থলি আর হাতে লম্বা লাঠি নিয়ে একবারও না থেমে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল ত... সড়ক দিয়ে। লোকটা গেরাসিম। একবারও পেছন না ফিরে হনহনিয়ে তার গ্রাম, তার জন্মস্থানের দিকে যাচ্ছিল সে। বেচারা মুমুকে ডুবিয়ে মারার পর সে ছুটে আসে নিজের কুঠরীতে, তাড়াতাড়ি তার কিছু জিনিসপত্র একটা পুরানো ঘোড়ার কম্বলে পুঁটলি বেঁধে কাঁধে চাপিয়ে উধাও হয়ে যায়। যখন তাকে মস্কোতে আনা হয় তখনই সে ভালো করে রাস্তাটা চিনে রেখেছিল; যে গাঁ থেকে কর্ত্রী তাকে আনিয়েছিলেন সেটা বড় সড়ক থেকে মাত্র দশ ক্রোশ দূর। এই রাস্তা দিয়েই হাঁটছিল সে একটা উদ্দাম বেপরোয়া ভঙ্গিতে, একটা মরীয়া অথচ সেই সঙ্গে সহর্ষ সংকল্প নিয়ে। তার কামিজের বুক হাট করে খোলা; একাগ্র অধীর দৃষ্টি কেবল সামনে নিবদ্ধ। তাড়াতাড়ি সে হেঁটে চলল যেন তার বুড়ী মা তার অপেক্ষায় আছেন, অজানা দেশে, অচেনা সব লোকদের মধ্যে দীর্ঘ প্রবাসের পর মা তাকে ডাক দিয়েছেন ঘরে ফিরতে... গ্রীষ্মের রাত সবে শুরু হয়েছে, উষ্ণ আর শান্ত; একদিকে, সূর্য যেখানে অস্ত গেছে, চক্রবাল এখনো আলোকোজ্জ্বল, অপসৃয়মান দিনের শেষ ছটায় সামান্য রক্তিম, অন্যদিকে নীলচে-ধূসর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। রাত্রি নামল সেখান থেকে। শত শত তিতির পাখী প্রচণ্ড কোলাহল জুড়েছে, পরস্পর ডাকাডাকি করছে ল্যাণ্ড্রেল পাখীরা... গেরাসিম এ সব শুনতে পাচ্ছিল না, শুনতে পাচ্ছিল না জোর পায়ে পাশ দিয়ে যাবার সময় গাছগুলোর

মৃদু নিশিমর্মর; কিন্তু পাচ্ছিল অন্ধকার মাঠ থেকে ভেসে আসা পেকে-ওঠা রাইশস্যের পরিচিত গন্ধ, অনুভব করছিল সারা গায়ে, মুখে, চুলে আর দাড়িতে তার জন্মভূমির হাওয়ার আদরের পরশ, দেখতে পাচ্ছিল সামনে তার ধূধূ পথ, তীরের মতো সটান ঘরে ফেরার রাস্তা; দেখছিল আকাশের অসংখ্য তারায় তার পথ আলো, আর সিংহের মতো বিক্রমে আর স্ফূর্তিতে সে এমনভাবে এগিয়ে চলল যে উদীয়মান সূর্যের সিক্ত-রক্তিম আলো যখন সদ্য-অভ্যস্ত পথচারীর ওপর ছড়িয়ে পড়ল তখন তার আর মস্কোর মাঝে চোদ্দ ক্রোশের ব্যবধান...

দুদিনে সে ঘরে পৌঁছে গেল, তার আপন কুঁড়েঘরে, তার অবর্তমানে সেখানে ঠাঁই পাওয়া এক সৈনিকের স্ত্রীকে অত্যন্ত অবাক করে দিয়ে। দেবদেবীমূর্তির সামনে প্রার্থনা শেষ করেই সে গেল গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে দেখা করতে। সে লোকটিও একটু অবাক হল; কিন্তু সবে ঘাস কাটার মরশুম লেগেছে, আর গেরাসিম যেহেতু চমৎকার কাজের লোক, তাই তৎক্ষণাৎ তার হাতে একটা কাস্তে ধরিয়ে দেওয়া হল; সেও সেই আগের মতোই ঘাস কাটতে লেগে গেল, আর কাটতে লাগল এমনভাবে যে তার টানের বহর দেখে অবাক হয়ে গেল চাষীরা...

আর মস্কোতে গেরাসিমের পলায়নের পরের দিন টের পাওয়া গেল যে সে উধাও হয়ে গেছে। ওরা তার ঘরে গিয়ে তল্লাস করে খবর দিল গাভ্রিলাকে। সেও গিয়ে, চারদিক দেখে, ঘাড় কুঁচকে স্থির করল যে বোবাটা হয় পালিয়েছে না হয় তার বোকা কুকুরটার সঙ্গে নিজেও ডুবে মরেছে। পুলিসে খবর দেওয়া হল, কর্ত্রীকেও জানান হল। তিনি রেগে আগুন হয়ে, কেঁদে কেটে হুকুম দিলেন যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বার করতে হবে; সকলকে নিশ্চয় করে বলতে লাগলেন তিনি কখনও কুকুরটাকে মেরে ফেলার হুকুম দেন নি, আর শেষে গাভ্রিলাকে এমন ধমক দিলেন যে সে সারাদিন খালি মাথা নেড়ে বলতে লাগল 'হুঁ!' — শেষ পর্যন্ত 'লেজা' খুড়ো আবার তাকে ঠাণ্ডা করল 'হুঁ-রে' বলে। অবশেষে গেরাসিমের গাঁয়ে ফেরার খবর পৌঁছল মস্কোতে। কর্ত্রী খানিকটা শান্ত হলেন; প্রথমটা তিনি হুকুম করেছিলেন তাকে অবিলম্বে মস্কোতে ফিরিয়ে আনার জন্যে, কিন্তু পরে বললেন এমন অকৃতজ্ঞ লোকের তাঁর কোন দরকার নেই। তবে অচিরে নিজেই তিনি মারা যান। তাঁর উত্তরাধিকারীদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না গেরাসিমকে নিয়ে। এমনকি তাদের মায়ের অন্য চাকরবাকরদেরও তারা খাজনা-বন্দি মজুরি খাটতে ছেড়ে দিল।

গেরাসিম এখনও তার নির্জন কুঁড়েঘরে একলা থাকে; এখনও সে তেমনি জবরদস্ত পালোয়ান, চারজনের কাজ একা করতে পারে, আর আগের মতোই সে এখনও সাধু আর গম্ভীর। প্রতিবেশীরা কিন্তু লক্ষ্য করেছে যে মস্কো থেকে ফেরার পর সে মেয়েদের সংস্রব একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে, এমনকি তাদের দিকে তাকায় না পর্যন্ত, আর কুকুরও পোষে নি একটিও। চাষারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'তা, মাগী ছাড়া যদি ওর চলে, সে তো ভালোই। আর কুকুর? কী দরকার ওর কুকুরে, চোরকে বেঁধে আনলেও ওর আঙিনায় তারা পা দিতে যাবে না!' এমনি কিংবদন্তী ছড়িয়েছে বোবাটার আসুরিক শক্তি নিয়ে।

১৮৫২

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

И. С. Тургенев
«МУМУ»
На языке бенгали